২০০২

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ☐ ২০তম সংখ্যা

৩০ এপ্রিল, ২০০২ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ন্যাশনাল আমীর ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন

সৈয়দপুর জামাতে বিশেষ মোনাজাতরত

জগদল জামাতে

বীরগঞ্জ জামাতের জনাব ইউসুফ আলীর আত্মকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠানে

খেলাফতের কল্যাণ

পবিত্র কুরআনের সূরাতুন্ নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফে ঐশী প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী- 'সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়ত'- অর্থাৎ অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) মোতাবেক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে ইসলামে পুনরায় প্রতিশ্রুত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা মহা সৌভাগ্যবান যে, এ খেলাফতে অন্তর্ভুক্তির সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে ইসলামী খেলাফতের এ দ্বিতীয় বিকাশকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকার আশ্বাস-বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এ খেলাফতকে দীর্ঘস্থায়ী করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে খেলাফতের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তা যদি আমরা সঠিকভাবে পালন না করি তাহলে আমাদের দ্বারা খেলাফত দীর্ঘস্থায়ী হবে না আর আমরাও এতদ্দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হতে পারবো না।

খেলাফতের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মাঝে সব চেয়ে বড় যে বিষয়টি তা'হল খেলাফতের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। আর শুধু খেলাফতের প্রতি আনুগত্য থাকলেই চলবে না বরং খেলাফতের অধীনস্থ যে চেইন অব কমান্ড আছে তার প্রত্যেক ধাপের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য থাকতে হবে। আজকে আহমদী জামাত একটি ক্ষুদ্র জামাত হয়েও যে সারা বিশ্বে অসাধ্য সাধন করে যাচ্ছে, তার মূল শক্তি যোগাচ্ছে খেলাফত এবং এর প্রতি আহমদীগণের ঐকান্তিক আনুগত্য।

প্রত্যেক বছর ২৭শে মে তারিখে আমরা খেলাফত দিবস পালন করে থাকি। আমাদের এ দিবসটি পালন সার্থক হবে যদি আমরা সকলে খেলাফত তথা গোটা খেলাফতের যে ব্যবস্থাপনা এর প্রতি আনুগত্যের বিষয়টিকে সত্যিকার অর্থে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে। আল্লাহ্তাআলা সর্বদা আমাদেরকে এ খেলাফতের প্রতি দায়িত্বপালন ও এথেকে কল্যাণ লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

সকল জামাতকে খেলাফত দিবসের কর্মসূচী পালন করে নতুন প্রজন্মকে ও নবীদিক্ষিতদের খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর চেষ্টা করার জন্যে বলা হচ্ছে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ২০তম সংখ্যা

১৭ বৈশাখ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১৬ সফর ১৪২৩ হিঃ কাঃ
৩০ শাহাদত ১৩৮১ হিঃ শাঃ ৩০ এপ্রিল, ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে ৮ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

খেলাফত-ব্যবস্থা আহমদীয়তের অনন্য বৈশিষ্ট্য

ধর্ম জগতে খেলাফত-ব্যবস্থা অপরিহার্য। হযরত আদম (আঃ)-থেকে শুরু করে প্রত্যেক নবীর যুগেই তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ও পূর্ণতা দেয়ার জন্যে খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবহমান ছিলো। প্রত্যেক ধর্মীয় ইতিহাস পাঠক তা অবহিত আছেন। খেলাফত-ব্যবস্থা ইসলামেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে নবুওয়তের পরে চিমনীস্বরূপ খেলাফত-ব্যবস্থা হলো ইসলামের দেহে আত্মাবিশেষ। তাই সূরা নূরের সপ্তম রুকূতে আল্লাহ্‌তাআলা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সবল, সুঠাম, সুনিয়ন্ত্রিত, সক্রিয়, গতিশীল এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি, শংকা, দুর্বলতা, শিরক-তথা পদস্খলন থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে স্বীয় নিয়ন্ত্রিত ও ছত্রছায়ায় খেলাফত-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন; এমন কি হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও কিয়ামকাল ব্যাপী খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও প্রবহমানকল্পে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে একটি ঐতিহাসিক অবশ্য ঘটনীয় পর্যায়ক্রমিক চিত্রের বর্ণনা প্রদান করেছেন। যেমন তিনি (সাঃ) বলেছেন- আমার নবুওয়ত যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তোমাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি তা তুলে দিবেন। তারপর নবুওয়তের তরীকা ও পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন তা তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা তুলে নিবেন। তারপর আত্মঘাতি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তা তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা তুলে নিবেন। তারপর জোর-জবরদস্তিমূলক বিচ্ছিন্ন শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তোমাদের মধ্যে তা ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা-ও তুলে দিবেন। তারপর তিনি পুনরায় নবুওয়তের তরীকা ও পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। এ পর্যন্ত বলে হুযূর (সঃ) নীরব থাকলেন। (মিশকাতুল মাসাবিহ্; বাবুল ইনযার ওয়াত্ তানযীর, পৃষ্ঠা-৪৬১)

বিগত চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা নবী করীম (সঃ) বর্ণিত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত চিত্রটির হুবহু রূপায়ণ দেখতে পাই। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর নবুওয়তের পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উপরের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা ৩০ বছর অব্দি প্রতিষ্ঠিত থাকার পরে খেলাফত-ব্যবস্থার চিরশত্রু ইবলীসি শক্তির চক্রান্তে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার মাধ্যমে তখনকার মত প্রকৃত খেলাফত-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়। তারপর পর্যায়ক্রমে দামেস্কে উমাইয়া, বাগদাদে আব্বাসী, মিশরে ফাতেমী ও পরে তুরস্কে উসমানীয়া প্রভৃতি রাজতন্ত্র / স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এ রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রগুলোকে খেলাফতের বস্ত্রাবরণে চালানো হয়, কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে এগুলোকে যথার্থই 'মুলকান আয্যান' ও 'মুলকান জাবারিয়ান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও এ নামসর্বস্ব খেলাফতের ইতি টানা হয় তুরস্ক- পিতা মোস্তফা কামাল পাশার মাধ্যমে। আর ঐ সময়েই খেলাফত-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ খেলাফত আন্দোলন চালানো হয়েছিলো জোরে শোরে। অথচ ইহা সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক খেলাফত তিনিই প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তা সম্ভব নয়। তাই যথাসময়েই আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে খেলাফত 'আলা মিন হাজিন নবুওয়ত অর্থাৎ নবুওয়তের তরীকা ও পদ্ধতিতে পুনরায় ইসলামে খেলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাঠোমোগত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত হাজীউল হারামাঈন শরীফাঈন হাফেয হাকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার মাধ্যমে। এ খেলাফত-ব্যবস্থা আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও কেয়ামত পর্যন্ত এর স্থায়ী থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর মাহ্‌দীর বক্তব্যে (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক দ্রঃ), তবে তা অবশ্যই মু'মিন সমাজের ঈমান ও আমলে সালেহার সাথে শর্তযুক্ত। আর সারা বিশ্বে ইসলামে আহমদীয়া খেলাফতের নেতৃত্বে তৌহীদের ঝান্ডা-নিয়ে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বীর সেনানীরা ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ খেলাফতের মাধ্যমেই ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সংঘটিত হবে। তখন সারা বিশ্বে ধর্ম বলতে বুঝাবে ইসলাম আর নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় মহানবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুন্ নূর - ২৪	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
■ অমৃত বাণী ঃ নবুওয়তের পরে দ্বিতীয় কুদরত ঃ খেলাফত হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ আল্ ওসীয়্যত (বাংলা) পুস্তক থেকে	৪
■ জুমুআর খুতবা ঃ খেলাফতের মাধ্যমে মু'মিনদের ভয়-ভীতি দূরীভূত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১০
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলা আযীয সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১১-১৫
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৬-১৭
■ রসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত্র মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৮-১৯
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২০-২১
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২২
■ নতুনদের পাতা		
● কাশ্মীর উপত্যকার প্রথম দায়ী ইল্লাল্লাহ্ ঃ হযরত মাওলানা মাহবুব আলম মূল ঃ জনাব আব্দুল ওহাব আহমদ	ঃ ভাষান্তর - জনাব কওসার আলী মোল্লা	২৩-২৫
● হযরত মূসা (আঃ)	ঃ মৌঃ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন	২৬-২৭
● খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ	ঃ মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব (জয়)	২৮-২৯
■ সংবাদ	ঃ	৩০-৩১

প্রচ্ছদ ঃ উপরে - মসজিদুল মাহ্দী, রংপুর জামাত ও নীচে - মাহীগঞ্জ জামাতের মসজিদ

কালামুল ইমাম
খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত সম্বন্ধে

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আউলিয়ায়ে কেরাম লিখে গেছেন ... যখন কোন রসূল বা ওলীআল্লাহ্র ইন্তেকাল হয়, তখন পৃথিবীতে এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সময়টা বড় ভয়ংকর সময় হয়। তবে ঐ সময় আল্লাহ্তাআলা কোন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে ঐ অবস্থার নিরসন করেন। অতঃপর পুনরায় ঐ খলীফার মাধ্যমে অবস্থার সংশোধন ও উন্নতি দান করেন।" (আল্ হাকাম ১৪ই এপ্রিল, ১৯০৮ইং)

হযরত **মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন,** "খলীফা সে যে কোন প্রকারেরই হোক না কেন, এর নির্বাচন আল্লাহ্তাআলাই করে থাকেন। হযরত আদম (আঃ)-কে তিনি খলীফা নির্বাচন করেছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ)-কেও তিনি খলীফা নির্বাচন করেছিলেন। আমাদের সবাইকে তিনিই খলীফা মনোনীত করেছেন। হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর পরে যাঁরা খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন,

যারা মু'মিনদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচিত হন তাঁদেরকেও আল্লাহ্তাআলাই নির্বাচিত করে থাকেন। তাঁরা যখন কোন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন খোদাতাআলা তাঁদের শক্তিশালী করেন। যখন তাঁরা অশান্তিতে পড়ে তখন তিনি তাঁদের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করেন। যারা খেলাফতকে অস্বীকার করে তাদের পরিচয় হচ্ছে এই যে, তাদের কাজে- কর্মে পুণ্য বা সততার অভাব ঘটতে থাকবে। ধর্মে কাজের বা সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে" (আল্ ফযল, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ইং)।

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল বললেন, "দেখ! আমার দোয়া আল্লাহ্র আরশে গৃহিত হয়। আমার প্রিয় খোদা, আমার মালিক, আমার দোয়ার পূর্বেই আমার কাজ সম্পাদন করে দেন। আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হবে। ... যারা হযরত সাহেবের (আঃ) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয় তারা আহমদী নয়। যে বিষয়ে হযরত সাহেব (আঃ) কিছু বলেন নি- এমন বিষয়ে তোমাদের নিজ থেকে কিছু বলার অধিকার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দরবার থেকে অনুমতি দেয়া না হয়। সুতরাং যতক্ষণ খলীফা কিছু না বলেন অথবা খলীফার খলীফা পৃথিবীতে আবির্ভূত না হন ততক্ষণ তোমরা কোন প্রকার মন্তব্য করা থেকে বিরত থাক" (বদর ১১ জুলাই, ১৯১২ইং)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে একজন আছেন যিনি তোমাদের ব্যথায় ব্যথিত হন, তোমাদিগকে ভালবাসেন। তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হন। তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন। তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়ারত থাকেন। অন্যদের জন্য এমন কেউ নেই" (বরকতে খেলাফত-পৃঃ ৫)।

বাকী অংশ ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সূরাতুন্ নূর-২৪

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَ اِنْ تُطِيْعُوْهُ
تَهْتَدُوْا ۚ وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۵۵﴾

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এ রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে এ রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যা তাকে অর্পণ করা হয়েছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যা তোমাদিগকে অর্পণ করা হয়েছে। যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তা হলে তোমরা হেদায়াত পাবে। আর এ রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছিয়ে দেয়া।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ
وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِيْ
لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ۚ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬। তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদেরকে পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যাকে তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন ও তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাদের জন্যে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। আর এর পর যারা অস্বীকার করবে, তারা হবে দুষ্কৃতকারী।[২০৫৭]

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর দয়া করা যায়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ
وَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۵۸﴾

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করো না যে, যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করতে পারবে, তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

২০৫৭। যেহেতু খেলাফত সম্বন্ধে বিষয়-বস্তুর ভূমিকাস্বরূপ এই আয়াত প্রস্তাবনাস্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২-৫৫ আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর বার বার জোর দেয়া হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান এবং মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটিতে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদিগকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু খেলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত নবী করীম (সঃ)-এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এখন মানব জাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথ-নির্দেশক, সে কারণেই তাঁর খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হয়ে যাবে। অপরাপর সকল নবীর উপর আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। আমাদের বর্তমান যামানায় আঁ হযরত (সঃ)-এর এই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক 'খেলাফত' পরিলক্ষিত হচ্ছে কেবল আহমদীয়া জামাতের মধ্যে, যা আঁ হযরত (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক খলীফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃষ্ঠা ১৮৬৯-১৮৭০)।

হাদীস শরীফ

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত

হাদীস ঃ

আন হুযায়ফাতা (রাঃ) ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে (সঃ) তাকুনূন্ নবুওওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহ্ আন তাকুনা সুম্মা ইযারফাউহাল্লাহুতাআলা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজেন নবুওওয়াতে মাশাআল্লাহ্ আন তাকুন্না সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহুতাআলা সুম্মা তাকুনু মুলকান আযযান ফাতুকুনু মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহুতাআলা সুম্মা তাকুনু মুলকান জাবারিয়্যাতান ফাতুকনা মাশাআল্লাহ্ আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহুতাআলা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওওয়াতে সুম্মা সাকাতা।

অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তাআলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্তাআলা উহা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন উহা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সঃ) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্তাআলা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার উপর সঠিকভাবে আমল করবে তখন আল্লাহ্‌র এই অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলেন,

"কিছু লোক **ওয়াদাল্লাহুল্ লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আমেলুস সলেহাতে লাইয়াস তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম**'এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম'-(তোমাদের মধ্য হতে - অনুবাদক)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রাঃ) নিয়ে থাকেন। এবং বলেন, খেলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের নাম গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খেলাফত স্বপ্নের মত শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধপতনের অশুভ গর্তে নিপতিত হয়ে গেল।"

"এই আয়াতগুলিকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কীভাবে বলতে পারি

যে, ঐ ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খেলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খেলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?"

"যেহেতু কোন মানুষের জন্য স্থায়ীত্ব নেই তাই আল্লাহ্‌তাআলা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এই উদ্দেশ্যে তিনি খেলাফত সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনো বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে সে মূর্খতাবশতঃ খেলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদাতাআলার উদ্দেশ্য কখনও এই ছিল না যে, রসূলে করীম (সঃ)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন এবং এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের খেলাফতের রজ্জুকে ধরে উহার আশীষ হতে কল্যাণমন্ডিত হবার তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

নবুওয়তের পরে দ্বিতীয় কুদরত ঃ খেলাফত

"খোদাতাআলা দু'প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন ঃ ১। প্রথমতঃ নবীগণের দ্বারা তাঁর শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। ২। দ্বিতীয়তঃ অপর হস্ত এরূপ সময়ে প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে থাকে যে, এখন (নবীর) কার্য ব্যর্থ হয়ে গেছে; তখন তাদের এই প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত (ধরাপৃষ্ঠ হতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবে; এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কটিদেশ ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতাআলা দ্বিতীয়বার আপন মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদাতাআলার এ মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে। যেমন হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞ লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের ন্যায় হয়ে পড়েছিলেন।

তখন খোদাতাআলা হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এরূপে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ হতে রক্ষা করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"ভয়ের পর আমি তাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করব" (সূরা নূর ঃ ৫৬)।

হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়েও এমনই হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনী ইস্রাঈলকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করবার পূর্বেই মিশর হতে কেনানের পথে মৃত্যু বরণ করেন। ইহাতে বনী ইস্রাঈলের মধ্যে তাঁর মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হয়েছিল। তওরাতে উল্লেখ আছে যে, বনী ইস্রাঈল এ অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর এ আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোদন করেছিল। অনুরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়ও ঘটেছিল। ক্রুশের ঘটনাকালে তাঁর সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মধ্যে একজন ধর্মচ্যুতও হয়েছিল।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্‌তাআলা বিধান ইহাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং এখন ইহা সম্ভবপর নয় যে, খোদাতাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, ইহা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং উহা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতাআলা বলেছেন ঃ

"আমি তোমার অনুবর্তী এ জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দিব"। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এর পর সেই দিবস আগমন করে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস।

আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদেরকে সব কিছুই দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন, অতএব তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকে। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামাতের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদিগকে ইহাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী! স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট জানবে; তোমরা জান না যে, সে মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামাতের পবিত্রচেতা বুযূর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়াত (দীক্ষা) নিবেন। * খোদাতাআলা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্র করেন। ইহাই খোদাতাআলার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৪-১৬ বাংলা সংস্করণ)।

* এরূপ ব্যক্তিগণ মু'মিনগণের সম্মিলিত রায়ে নির্বাচিত হবেন। যাঁর সম্বন্ধে ৪০ জন মু'মিন একমত হয়ে বলবেন যে, তিনি আমার নামে লোকের বয়াত নেবার উপযুক্ত, তিনি বয়াত নেবার অধিকারী।

খেলাফতের মাধ্যমে মু'মিনদের ভয়-ভীতি দূরীভূত

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা দেন।

শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা আজও অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শান্তি-শৃঙ্খলা কখন কীভাবে সৃষ্টি হয় এবং কখন এর প্রয়োজন হয় এবং অস্থিরতা ও ভয়-ভীতিকে আল্লাহ্ কীভাবে দূর করেন– এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম সূরাতুন্ নূরের ৫৬নং আয়াত পেশ করছি ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ্ তাদের সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন। যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দীনকে, [ধর্মকে] যাকে তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন, সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর ইহাকে তাদের জন্য তিনি নিরাপদ অবস্থায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এবং তারপর যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে দুষ্কৃতকারী।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তারপর যখন তিনি চাইবেন ইহাকে তুলে নিবেন। তারপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি চাইবেন। তারপর তিনি যখন চাইবেন ইহাকে তুলে নিবেন। তখন যুলুম-অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। এটা ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌তাআলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন তখন এটাকে তুলে নিবেন। এবার সেটা অহংকার ও জোর জবর-দস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন ততদিন এমন অবস্থা বিরাজ করবে। তারপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন তখন এটাকে তুলে নিবেন। তারপর আল্লাহতাআলা নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত [হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে] কায়েম হবে। এই বলে হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম (এমন অবস্থায়) সূরা জুমুআ নাযেল হোল। হুযূর (সঃ) আমাদেরকে পড়ে শোনালেন। হুযূর (সঃ) যখন পড়লেন, **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম** অর্থঃ এবং [তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন] তাদের মধ্যে হতে অন্য লোকদের মধ্যেও যারা এখনও পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নি। তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এরা কারা (কোন জাতির মানুষ)? আঁ হযরত (সঃ) কোন উত্তর দিলেন না। ঐ ব্যক্তি দু বা তিন বার ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) আমাদের মধ্যেই বসে ছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) নিজ পবিত্র হাত তার কাঁধের উপর রেখে বললেন, 'যদি ঈমান সুরাইয়া (নক্ষত্র)-এর কাছেও চলে যায় তবে এদের মধ্য থেকে কিছু রেজালুন ব্যক্তি ঈমানকে ফেরত আনবে" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)

অপর এক বর্ণনায় "কিছু লোক" এর স্থলে "একজন" (রাজুলুন) উল্লেখ আছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের উদাহরণ এমন বৃষ্টির মত যে, বলা যায় না, ঐ বৃষ্টির প্রথম অংশ উত্তম না কি শেষের অংশ উত্তম" (তিরমিযী-কিতাবুল আমসাল)

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আজকাল আল্লাহ্‌র ফযলের যে বৃষ্টি হচ্ছে এটাও আঁ হযরত (সঃ)-এর কল্যাণেরই বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা একথা বলি না যে, আহমদীয়তের পৃথক কোন ফযলের বৃষ্টি। সুতরাং এসব কিছুই আঁ হযরত (সঃ)-এর কল্যাণে আল্লাহ্‌র ফযলের বৃষ্টি। এর প্রথম বৃষ্টির কি অবস্থা ছিল আর আজ দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃষ্টির কি অবস্থা এর পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং এ সমস্ত কিছু আঁ হযরত (সঃ)-এরই বরকত।

আর একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন,

"হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম ইমামে আদেল অর্থাৎ ন্যায় ও সত্যের সাথে বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারক হয়ে আসবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন। শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। তরবারীগুলোকে কাস্তেতে রূপান্তরিত করবেন (অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে মানুষ আবার কৃষি কাজে মনযোগ দিবে)।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত একজনের কথা বলা হয়েছে- পূর্বের ঈসা (আঃ)-এর কথা বলা হয় নি। অনুরূপভাবে বাকী সমস্ত কথাই রূপক ভাষায় বলা হয়েছে। যেমন ক্রুশ ধ্বংস অর্থ তিনি নিজ হাতে বাহ্যিক ক্রুশ ভেঙ্গে বেড়াবেন একথা ঠিক নয়। কারণ এভাবে তো তিনি ক্রুশ ভাঙ্গতে থাকবেন অপর দিকে নতুন ক্রুশ বানানো চলতে থাকবে। এ ধারা তো কখনও শেষ হবার নয়। অনুরূপভাবে শূকর নিধন অর্থ এই নয় যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিকা) নাযেল হয়েই জঙ্গলে প্রবেশ করবেন

শূকর ধ্বংস করতে ব্যস্ত থাকবেন। এভাবেও তো অনেক স্থানে শূকর পোষা হচ্ছে- ঐ সমস্ত স্থানে গিয়ে তিনি শূকর মারতে থাকবেন অপর দিকে অন্য অঞ্চলে শূকরের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকবে।

সুতরাং এ সমস্ত কথা বড় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বুঝতে চেষ্টা করা উচিত যে, এসব কথার মর্মার্থ কী? ক্রুশ ধ্বংস অর্থ তিনি ক্রুশ মতবাদ ও খৃষ্ট ধর্মের মূল উৎপাটন করবেন। শূকর বদ অর্থ শূকরের স্বভাববিশিষ্ট মানুষকে ধ্বংস করা। যাদের স্বভাবের মধ্যে এ ধরনের জঘন্য অভ্যাস আছে তাদেরকে ধ্বংস করা। তরবারীকে কাস্তেতে পরিবর্তন করার অর্থ হযরত ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীর যুগে তরবারির যুদ্ধের প্রচলন থাকবে না। এবং কৃষিকাজে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন হবে। অপর হাদীসে দেখুন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে "হারেস" উপাধি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যিনি কৃষি কাজ করেন। বর্তমান যুগে কৃষি কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। মানুষ এদিকে দিন দিন বেশি মনোযোগী হচ্ছে। বর্তমান যুগে যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, এখন তরবারি দিয়ে মানুষ হত্যার তুলনায় কৃষি কাজের জন্য বেশি চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

১৮৯৯ইং সনে এলহাম হয়েছে, "আল্লাহ্ আমাকে খবর দিয়েছেন, "তোমার দ্বারা সুখ-শান্তি ও সুলহ্ (মীমাংসা) বিস্তার লাভ করবে। এক হিংস্র পশু ও ছাগলের সাথে সুলহ্ (বিবাদ-মীমাংসা) করবে। এক সাপ শিশুদের সাথে খেলবে। এটি খোদাতাআলার ইচ্ছা। যদিও মানুষ আশ্চর্য হয়ে দেখে" (তিরিয়াকুল কুলুব, টীকা, পৃঃ ৩২; বিজ্ঞাপন, ওয়াজীবুল ইযহার)।

এসব কথা রূপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এর অর্থ এমন নয় যে, বাস্তবে কোন হিংস্র জন্তু ছাগলের সাথে আপস করবে। আল্লাহ্ এদের বিপরীতমুখী করে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ হিংস্র জন্তুর ন্যায় মানুষ যারা নিরীহ মানুষের উপর যুলুম অত্যাচার করে তারা ভবিষ্যতে এমন অত্যাচার থেকে বিরত থাকবে। সাপ শিশুদের সাথে খেলবে। এমন ঘটনা বাহ্যিকভাবেও ঘটেছে। আমাদের সিন্ধুদেশে এমন দেখা গেছে। সেখানে এক ধরনের সাপ আছে যা দিনের বেলায় চোখ খুলতে পারে না। চোখ বুজে পড়ে থাকে। কাউকে কামড় দিতে পারে না। শিশুরা দেখতে পেলে বা হাতের কাছে পেলে অনেক সময় ধরে ফেলে। খেলা করে। সাপ চুপচাপ থাকে। কোন কোন কথা বাহ্যিকভাবেও পূর্ণ হতে পারে- হচ্ছেও।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

এটাই ক্রুশ ধ্বংস ও যুদ্ধ রহিত করণের আসল ব্যাখ্যা। এটা একটা ভুল ও মিথ্যা ধারণা যে, যুদ্ধ হবে। বরং হাদীসের অর্থ এই যে, হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে ঐশী অস্ত্র থাকবে। অর্থাৎ ঐশী নিদর্শন এবং নতুন বাতাস। এ দু'টি জিনিস দিয়ে দাজ্জালকে ধ্বংস করা হবে। এবং শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সত্য তৌহীদ-ন্যায় ও ঈমান উন্নতি লাভ করবে। শত্রুতা থাকবে না সুখ-সম্প্রীতির যমানা এসে যাবে। তারপর পৃথিবীর সমাপ্তি হবে। এ জন্য আমরা এই বয়ের নাম "আইয়ামে সুলহ্" রেখেছি" [আইয়ামে সুলহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৪ খন্ড, পৃঃ ২৮৬]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"আল্লাহ্তাআলা আমার সম্পর্কে বলেছেন, "সালমানো মিন্না আহলাল বায়তে"

অর্থ ঃ এই বান্দা দু'টি সুলহ্ (আপোষ মীমাংসা)-এর ভিত্তি স্থাপন করবেন। আমাদেরই একজন তিনি, 'আহলে বায়ত' [আঁ হযরত (সঃ)-এর পরিবারের সদস্য - অনুবাদক] এই ঐশী বাণী ঐ প্রসিদ্ধ ঘটনার সত্যায়ন করছে যেখানে বলা হয়েছে যে, আমার কোন দাদী আম্মা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর আওলাদ ছিলেন। আল্লাহ্তাআলা ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি আমার দ্বারা দু'টি সুলহ্ (মীমাংসা) করাবেন। একটি আমার হাত দিয়ে এবং আমার দ্বারা ইসলামী ফিরকাসমূহের মধ্যে হবে। ভোদাভেদ দূরীভূত হবে। সমস্ত ফির্কা এক জামাতে পরিণত হবে। দ্বিতীয় সুলহ্ হবে এই যে, গয়ের ইসলামী শত্রুদের সাথে আপোস হবে। অনেককেই ইসলামের হাকীকত (মাহাত্ম্য) বুঝিয়ে দেয়া হবে এবং তারা ইসলামে প্রবেশ করবে। তারপর সমাপ্তি হবে" [হাকীকাতুল ওহী পৃঃ ৭৮, টীকা-পাদটীকা]।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, "যারা মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত হন তাদেরকেও আল্লাহ্ই নির্বাচন করেন। তাদের জন্য ভয়-ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু খোদাতাআলা তাদেরকে শক্তিশালী করেন। যখনই কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন পথ বের করেন। যারা বিরোধী তাদের পরিচয় এই যে, তাদের মধ্যে সৎকর্ম লোপ পেতে থাকবে। তারা আস্তে আস্তে ধর্মীয় কার্যক্রম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ্তাআলা ফিরিশ্তাগণকে বললেন, আমি খলীফা নির্বাচন করব? কারণ যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখন তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তগণকে ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। ফিরিশ্তাদের মনে যে আপত্তি উঠল তারা তা মার্জিত উপায়ে উপস্থাপন করলেন। একবার আমাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হযরত [মির্যা গোলাম আহমদ] সাহেব দাবী তো করেছেন-কিন্তু বড় বড় আলেমগণ বিভিন্ন আপত্তি তুলেছেন। আমি বললাম, আলেমরা কত বড়ই হোন, ফিরিশ্তাগণের চেয়ে বড় তো নন! ফিরিশ্তারাও আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি কি সেখানে তাকে খলীফা নির্বাচন করছ যে বড় ফেৎনা-ফাসাদ করবে, খুন-খারাবী করবে? (সূরাতুল বাকারা ঃ ৩১)। হে আল্লাহ্! আমাদের মনে এ প্রশ্ন জেগেছে। কিন্তু হে আমাদের প্রভু! আমরা তো তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। প্রশংসা বর্ণনা করছি। তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" খোদার নির্বাচনই যথার্থ ছিল। কিন্তু খোদার নির্বাচনের রহস্য তাদের বিবেক-বুদ্ধিতে কি করে ধরতে পারত" (আল্ ফযল কাদিয়ান, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ইং পৃঃ ১৫)।

এখানে, "যে ফেৎনা ফ্যাসাদ করবে, রক্তপাত ঘটাবে-" কথাটির আরো একটি দিক রয়েছে তা প্রনিধানযোগ্য। যখনই খোদার নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত হন পৃথিবীতে ফেৎনা ফ্যাসাদ তো অবশ্যই সৃষ্টি হয়। কিন্তু ফাসাদ কারা করে? নিশ্চয় বিরোধীরা ফাসাদ করে। নবীর তরফ থেকে কখনও ফাসাদ আরম্ভ হয় না। নবী সর্বকালে নিজের হেফাযত বা নিরাপত্তা বিধান করেছেন। আর বিরোধী শত্রু পক্ষই চিরকাল রক্তপাত ঘটিয়েছে। শত্রুরাই হামেশা নবীগণেরও পুণ্যবানদের রক্তপাত ঘটিয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেছেন, **ওয়ালাইউমক্কিনান্না লাহুম দীনাহুমুল্লাযীর তাযালাহুম**

আমাদের প্রেরিতগণের (নবীগণের) পরিচয় কী? এক নিদর্শন এই যে, তিনি এমন সব পুণ্যকর্মকে, যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন, পুনরায় কার্যকর করেন যা লোকেরা জানত কিন্তু তারা আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছিল এবং খোদাতাআলা তাকে এই কাজে শক্তি যোগান। এক প্রকার ক্ষমতা ও সমর্থন প্রদান করা হয়। যে কাজের জন্য তাকে পাঠানো হয় সেকাজ সম্পাদনের জন্য তাকে বহুভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ্র সাহায্য সমর্থন ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কেউ কোন কাজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বা দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারে না বড় বড় কঠিন সমস্যা ও বিপদাপদ এবং ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু খোদাতাআলা সমস্ত ভয়-ভীতি ও বিপদাবলীকে

শান্তি ও নিরাপদ অবস্থায় পরিবর্তন করে দেন। অশান্তি দূর করে দেন। কোন প্রেরিত বা প্রত্যাদিষ্ট ইমামের সত্যতার এটি একটি প্রমাণ।

এবার কামেল হেদায়াত দানকারী আঁ হযরত (সঃ)-এর অবস্থার কথা চিন্তা করে দেখুন। যখন তিনি (সঃ) সত্যের প্রতি আহ্বান করতে আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। পকেটে টাকা ছিল না। বাহুবল বা জনবল ছিল না। আপন ভাই কেউ ছিল না। মা-বাবার আশ্রয় ছিল না। তার গোত্র বা জাতি তার ব্যাপারে কোনই আগ্রহ রাখত না। শত্রুতা, বিরোধিতা চরম পর্যায়ে পৌছে ছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিরোধীরা যতদূর সম্ভব কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে (সঃ) দেশ থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেছে। হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। তারা কিইবা আর করে নি? কিন্তু ফলাফল কি হয়েছিল? কে অপদস্থ হয়েছিল?

হুযূর (সঃ)-এর শত্রুরা এমনভাবে মাটির সাথে মিশে গেল যে, তাদের কোন চিহ্নই বাকী থাকল না। ঐ দেশ যে দেশ কখনও কারো অধীনে ছিল না সে দেশ কার দখলে আসল? ঐ জাতি যারা তৌহীদের থেকে হাজারো ক্রোশ দূরে ছিল তারা তৌহীদের আওতায় আসল। শুধু তাই নয় বরং তৌহীদকে স্বীকার করে নিল। ভয়ংকর ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা হল। আঁ হযরত (সঃ)-এর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ)। তার জাতি বা গোত্রও ছোট ছিল। তিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর গোত্রের ছিলেন না। কিন্তু দেখেছেন যে, কীভাবে তিনি ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা বলে প্রমাণিত হলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে বিশ হাজার সাহাবা সৈন্য ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাদেরকে সিরিয়ার সীমান্তে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। যদি হযরত আবূ বকরের (রাঃ) সাথে হযরত উসামার সৈন্য বাহিনী থাকত তবুও হয়ত মানুষ বলত যে, তাদের বলে বলিয়ান হয়ে আবূ বকর (রাঃ) সাফল্য লাভ করেছেন। আরবের মরুভূমিতে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। তিনটি মসজিদ ব্যতীত নামায কায়েম হচ্ছিল না। এ সমস্ত হয়ে গেল। আমার খোদা কীভাবে সেদিন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর হাত ধরেছিলেন? রাফেজীরাও সাক্ষাৎ দিতে বাধ্য হয়েছিল যে, আসাদুল্লাহ্ গালেবও ভীত হয়ে সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছিল। কেমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়েছিল।' শিয়া সম্প্রদায় বলছে, হযরত আলী (রাঃ) ভয়ে-ভীত হয়ে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) সমর্থন করেছিলেন। যদি একথাই সত্য হয় তবে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে তো কোন কিছুই ছিল না! কিসের ভয় ছিল? সুতরাং আসল কথা এই যে, হযরত আলী 'সালেহ্' বুযূর্গ ছিলেন এবং কেবল খোদার ভয়ে ভীত ছিলেন। নতুবা মানুষের ভয়ে ভীত হবার মত ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন না। কেন এমন হোল? কারণ এই যে, তাঁকে (আবূ বকর রাঃ-কে) আল্লাহ্‌র খলীফা নির্বাচিত করেছিলেন। অনুরূপভাবে চিরকাল মানুষ যখন প্রেরিত এবং আদিষ্ট হয়ে আসেন তখন আল্লাহ্‌র মহাশান্তির বিকাশ আকারে তার সমর্থন করা দেখে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র হেফাযতে থাকেন। নিরাপদ থাকেন। স্মরণ রাখবে, যত প্রকার দুর্বলতাই থাকুক না কেন ওসব আল্লাহ্‌র মু'জিযা ও নিদর্শনস্বরূপ। কারণ ঐ সমস্ত দুর্বলতার মধ্যে আল্লাহ্‌র সাহায্যের সঠিক স্বাদ পাওয়া যায় এবং সঠিক অর্থে বুঝা যায়" (হাকায়েকে ফুরকান, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২২৯)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"খোদাতাআলা সৎকর্মশীল, ন্যায়পরায়ণ মু'মিনদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে খলীফা নির্বাচন করবেন। এমন খলীফা যেমন খলীফা ইতঃপূর্বে নির্বাচন করেছিলেন এবং পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে নেযামে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন পূর্বের নেযামে খেলাফতের অনুরূপ যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং তাদের ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম, যাকে তারা স্বানন্দে গ্রহণ করেছে, পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং এর ভিত্তি মজবুত করে দিবেন। এবং তাদের ভীতিপ্রদ অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক (অংশীদার) করবে না। দেখ, এখানে কত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, ভীতিপ্রদ অবস্থাও সৃষ্টি হবে যখন আরাম ও নিরাপত্তা থাকবে না। কিন্তু তারপর আল্লাহ্ আবার ভীতিপ্রদ অবস্থাকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ অবস্থায় পরিবর্তন করে দিবেন। সুতরাং এই ভয়ই হযরত ইউশা বিন নূন (রাঃ) সময় সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে আল্লাহ্‌র আয়াতে যেমন সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে তেমনই হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কেও আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।" (তোহ্‌ফা গোলড়বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খন্ড, পৃঃ ১৮৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন,

"এই যে, প্রত্যেক বিশৃঙ্খলা ও অশান্ত, ভীতি-প্রদ অবস্থায় যখন অন্তর হতে আল্লাহ্‌র ভালবাসা উঠে যায়, চারিদিকে অধর্মের বিস্তার ঘটে যায়, মানুষ পার্থিব জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে যায়, ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যে, তখন ঐ অবস্থায় খোদাতাআলা তাঁর আধ্যাত্মিক খলীফাগণকে সৃষ্টি করতে থাকবেন। যাঁদের হাতে আধ্যাত্মিকভাবে ঐশী সমর্থন ও ধর্মের বিজয় সূচিত হবে, সত্যের সম্মান ও মিথ্যার অপমান হবে যেন ধর্মের আসল পবিত্র অবস্থাও পুনর্বহাল হতে থাকে। এবং ঈমানদারগণ গোমরাহীর প্রসার এবং ধর্ম বিলুপ্ত হবার ভয় থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত হতে পারেন" (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা, ২৩৫, টীকা)।

তারপর হযরত (আঃ) লিখেছেন,

আলোচ্য আয়াতে মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কোন কোন মু'মিনকে নিজ অনুগ্রহ ও নিজ রহমতে খলীফা বানাবেন (নিযুক্ত/মনোনিত) এবং তাদের ভয়াবহ অবস্থাকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পরিণত করবেন। সুতরাং এটি এমন একটি কথা যার পূর্ণতা ও সত্যতা আমরা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের মধ্যে দেখতে পাই। সত্য অনুসন্ধানী গবেষকদের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তাঁর খেলাফতকালে প্রথম দিকে ভয়াবহ ও বিপদসংকুল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। আঁ হযরত (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলমানদের উপর নানা প্রকার বিপদাপদ ও ভয়ংকর দুর্যোগ নেমে এসেছিল। বহু মুনাফিক মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে ফিরে গিয়েছিল এবং এদের মুখ খুলে গিয়েছিল (ইসলামের বিরুদ্ধে কথার)। মিথ্যাদাবীকারকদের মধ্য থেকে একদল নবুওয়ত দাবী করে বসল। তাদেরকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বেদুঈন একত্র হয়ে গেল। মুসায়লামা কায্যাবের সাথে তো প্রায় একলক্ষ মূর্খ ও (ফাজের) বিদ্রোহী লোক মিলিত হয়েছিল। ফেৎনা-ফাসাদ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। অনেক রকম বিপদ এবং বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। মু'মিনরা এক ভয়ংকর ভূকম্পনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা প্রত্যেকেই বড় ঈমানী পরীক্ষায় পড়েছিলেন। বড়ই ভয়াবহ এবং বিবেককে বিভ্রান্ত করার মত, জ্ঞান-শূন্য করার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মু'মিনগণ বড় অসহায় বোধ করছিলেন। তাদের হৃদয়ের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড যেমন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল। অথবা এমন মনে হচ্ছিল যেমন ছুরিকাঘাত করে

তাদের জবাই করা হয়েছিল। কখনও তারা আঁ হযরত (সঃ)-এর ইন্তেকালের বেদনায় কান্না করতেন আবার কখনও আগুনের মত জ্বালাময়ী ফেৎনা-ফাসাদের যন্ত্রণায় কান্না করতেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তার কোনই ঠিকানা তাদের বাকী ছিল না। এই ভয়ংকর ফেৎনার মধ্যে পড়ে মুসলমানদের অবস্থা এমন পরাজিত অবস্থা হয়েছিল যেমন ইটের ভাটার উপরে ঘাস উৎপন্ন হয়ে ঢেকে দেয়। সুতরাং মু'মিনদের ভয় ও বিভ্রান্তিকর অস্থিরতা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের হৃদয় বিরাট ভয় ও অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় ভরে গিয়েছিল। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে যুগের বাদশাহ্ হযরত খাতামান্ নবীঈন (সঃ)-এর খলীফা করা হল। ইসলামের উপর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এবং যে সমস্ত কথা কুফফার মুনাফিক বা মুরতাদদের (ধর্মত্যাগী) মুখে তিনি শুনছিলেন তাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি বসন্তকালের বৃষ্টির ন্যায় কাঁদছিলেন। তাঁর চোখের পানি ঝর্ণার পানির মত বয়ে যাচ্ছিল। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে ইসলাম ও মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা যখন আবূ বকর (রাঃ)-কে খেলাফতের ভারী দায়িত্ব দিলেন, তিনি খলীফা হয়েই দেখলেন যে, চারিদিকে ফিৎনা-ফাসাদ উস্‌কে দেয়া হয়েছে। মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার আস্ফালন করছে, মুনাফিকরা ও মুরতাদরা বিদ্রোহ্ করতে যাচ্ছে। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর উপর এতবড় ভয়ংকর বিপদ আপতিত হয়েছিল যে, এতবড় বিপদ যদি পাহাড়গুলোর উপর আপতিত হোত তবে পাহাড়গুলো ভেঙ্গে পড়ত এবং গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। কিন্তু হযরত আবূ বকরকে রসূলগণের ন্যায় অসীম ধৈর্য-শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্‌র সাহায্য আসল। মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদারদেরকে হত্যা করা হল। ধর্মত্যাগীরা ধ্বংস হয়ে গেল। ফেৎনা-ফাসাদ দূরীভূত হল। পুরো বিষয়টির মীমাংসা করে দেয়া হল। খেলাফতের বিষয়টি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। আল্লাহ্ মু'মিনদের বিপজ্জনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন এবং যে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করল। ধর্মকে শক্তিশালী করা হল। ফেৎনা সৃষ্টিকারীদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দেয়া হোল। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন এবং হযরত আবূ বকরকে সাহায্য সমর্থন দিলেন। বিদ্রোহী এবং বড় বড় প্রতিমাগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। অবিশ্বাসীদের (কুফ্‌ফারদের) অন্তরে ইসলামের শক্তির সামনে ভয় সঞ্চার হোল। তারা পরাজিত হয়ে গেল এবং সত্যের সামনে নতজানু হয়ে গেল। বিদ্রোহ করা থেকে তওবা করল। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র এমনই অঙ্গীকার ছিল যিনি সকল সত্যবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী" (সিররুল খিলাফাহ্, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খন্ড; পৃঃ ৩৩৪)। দেখুন, ঠিক এমনই অবস্থা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর যুগেও সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্‌তেকালের পরে বিরোধীরা খুব উচ্চবাচ্য করছিল। এ উপমহাদেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকা লেখছিল, ব্যস! এই এক ব্যক্তির এক জীবনের বিষয় ছিল। এখন এই 'গোষ্ঠী' ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অনেকগুলো মুখ খুলে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল যে, এ ফেৎনা এতবড় প্রকট যে, এটার সমাধান নেই। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়ালকে অত্যন্ত নরম-আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। বয়স্ক ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে এত দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, সমস্ত ফেৎনার মাথা গুঁড়িয়ে দেয়া হোল। তিনি প্রথম খলীফা ছিলেন। তাঁর যুগে আহমদীয়া জামাত সম্পূর্ণরূপে একতাবদ্ধ হয়েছিল। কোন অংশ বিচ্ছিন্ন ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) হযরত আবূ বকরের অনুরূপ ছিলেন। তাঁর পরে কিছু কিছু ফিরকা সৃষ্টি হয়েছে। লাহোরী ফিরকা এবং আরো কোন কোন ছোট ফিরকা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ)-এর যুগে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মত সমস্ত মাত এক ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। কোন অংশই বিভক্ত ছিল না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"এ সমস্ত আয়াতে ভবিষ্যৎ যুগের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যেন ভবিষ্যতে এসব ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে তখন মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি হবে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিগুলো দেখে চিনতে পারবে। এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহ্ আঁ হযরত (সঃ)-এর ইন্‌তেকালের পরে ফেৎনা সৃষ্টি হয়ে মুসলমানদের বিপজ্জনক অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ঐ সময়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। তখন খেলাফতের কল্যাণে ধর্ম শক্তিশালী হবে"।

কোন কোন মু'মিনকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে লেখা হয়েছে কিছু কিছু মু'মিন খলীফা হবেন। বাস্তব এই যে, সকল মু'মিন সম্মিলিত হয়ে "এক খলীফা" হবেন। ভয়ংকর অবস্থাকে পরিবর্তন করতঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন এবং ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ফেৎনা সৃষ্টিকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর (রাঃ) যুগেই উত্তমভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে, অন্য কোন যুগে নয়। সুতরাং অস্বীকার করবেন না। কারণ এ সত্যতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইসলামকে এমন প্রাচীরের মত পেয়েছিলেন যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল বিদ্রোহীদের শত্রুতার কারণে। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের ঐ প্রাচীরগুলোকে সিমেন্ট-বালি দিয়ে ঢালাই করা শক্ত পাক্কা করে দিলেন। এমন দূর্গের মত করে দিলেন যার দেয়াল বা প্রাচীরগুলো লোহা নির্মিত যার ভেতরে এমন সৈন্যবাহিনী থাকে যারা দাসের মত অনুগত। অতএব বিবেচনা করে দেখুন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং এর কোন নজির অন্য জামাতে দেখানো সম্ভব নয়" (সিরুরুল খিলাফাহ, রূহানী খাযায়েন; ৮ম খন্ড; পৃঃ ৩৩৬)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"যেমন আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর যুগে ভয়াবহ অবস্থার পর নিরাপদ শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন শত্রুদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ইসলামকে শক্তিশালী করেছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদের যুগেও ঠিক তেমনই ঘটবে। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কাফির ঘোষণা করা, ফাসাদ সৃষ্টি করা এ সমস্ত কার্যকলাপ প্রচন্ড ঝড়ের মত প্রবল হবে। তারপর দেখা যাবে যে, মানুষের মধ্যে (মসীহ্ মাওউদ)-এর প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেয়া হবে। যথেষ্ট নূর বা আলো উৎসারিত হবে, তাদের চোখ খুলবে, তারা দেখবে যে, তাদের আপত্তি, অভিযোগের কোন যৌক্তিকতা নেই। তাদের অভিযোগ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তাদের ধারণা-কল্পনা খুব সাধারণ, মোটা বুদ্ধির পরিচায়ক, হিংসা-বিদ্বেষে ভরা ছিল। এটা মানুষ বুঝে যাবে। তারপর হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদের এই এক মিল আছে যা প্রমাণ করা হবে যে, ইসলাম ধর্মকে যেখানে শত্রুরা নির্মূল করতে চায় সেখানে এদের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে পৃথিবীতে দৃঢ়তার সাথে কায়েম করা হবে। এমন সুদৃঢ় করা হবে

যে, কেয়ামত পর্যন্ত আর দুর্বল হবে না। তৃতীয় সাদৃশ্য এই যে, মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে শির্কের যে অনুপ্রবেশ ও মিশ্রণ ঘটে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ তাদের অন্তর থেকে মুছে ফেলা হবে। এর অর্থ এই যে, মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাস (আকীদা)-এর মধ্যে শির্কের একটি বিরাট অংশ প্রবেশ করেছিল। এমনকি দজ্জালকেও আল্লাহ্‌র অনেক সিফত (গুণাবলী) প্রদান করা হয়েছিল এবং ঈসা মসীহ্‌কে সৃষ্টির কতক অংশের সৃষ্টিকর্তা (খালেক) মনে করা হয়েছিল। এ ধরনের যত প্রকার শির্ক-এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রত্যেক শিরককে দূরীভূত করা হবে। আলোচ্য আয়াতে (আয়াতে ইস্তিখলাফে) যেমন বলা হয়েছে ঃ **ইয়া'বুদুনানি লা ইউশরিকুনা বি শায়য়া** অর্থ ঃ তারা আমার ইবাদত করবে এবং কাউকে আমার শরীক করবে না থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।"

[তোহফায়ে গোলড়াবিয়া; রূহানী খাযায়েন; ১৭ খন্ড; পৃঃ ১৮৯]

"কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় আমাদের জামাতের মধ্যে কখনও দুর্বলতা দেখা দিবে না" বাক্যটি মানুষকে চিন্তা ও সন্দেহের মধ্যে ফেলতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আহমদীয়া জামাতের মধ্যে এক হাজার বছর পর্যন্ত সঠিকভাবে খিলাফত কায়েম থাকবে নষ্ট হবে না। তারপর যেমন প্রত্যেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানও এক সময় ভেঙ্গে পড়ে; যেমন দেখুন আঁ হযরত (সঃ)-এর ইন্‌তেকালের পর ইসলাম কত বড় সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, কত বিরাট শান-শওকত ও ঐতিহ্যের অতি উচ্চ শিখার পৌঁছেছিল- তারপর কী অবস্থা হ'ল (আস্তে আস্তে অধঃপতনে গেল)। আজ মৌলভীদের ফেৎনা কত প্রসার লাভ করেছে। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই এক সময় উন্নতির পরে অবশ্যই আবার অধঃপাতিতও হয়। যে একবার উদিত হয় সে অবশ্যই অস্তও যায়। সুতরাং এমন ধারণা করা যে, আহমদী জামাতে অধঃপতন আসবে না– ঠিক হবে না। বরং কিয়ামত অর্থ কী? কিয়ামতকাল তো সেটাই যখন আহমদীয়া খেলাফত আর সঠিক অবস্থা থাকবে না তখনই তো সবচেয়ে বড় কিয়ামত দেখা দিবে! ওটাই তো কিয়ামতের সময় বা যুগ হবে। তারপর তো দুষ্কৃতকারী দুষ্ট মানুষ সৃষ্টি হতে থাকবে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ۝

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন পুণ্যকর্ম নিয়ে আসবে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম (পুরস্কার) থাকবে এবং তারা সেদিন বিরাট অস্থিরতা থেকে নিরাপদে থাকবে (সূরাতুন্ নামল ঃ ৯০)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা কি জান যে, মুসলমান কে? সাহাবা বললেন, আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-ই ভাল জানেন। হুযূর (সঃ) বললেন, 'মুসলমান সে যার মুখ ও হাত হ'তে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ'। তারপর বললেন, 'তোমরা কি জান মু'মিন কে'? সাহাবা বললেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন'। তখন আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'মু'মিন সে যার পক্ষ থেকে বাকী সকল মু'মিনরা নিজেদের জান-মাল-এর ব্যাপারে নিরাপদ নিশ্চিন্ত থাকে। মুহাজির সে, যে মন্দ-কর্ম করা ছেড়ে দেয় এবং মন্দ থেকে নিজেকে রক্ষা করে" (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত আবূ যর গাফ্‌ফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে আরয্ করা হোল, হুযূর এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বললেন, যে পুণ্যকর্ম করে এবং মানুষ এ কারণে তার প্রশংসা করে? হুযূর (সঃ) বললেন, 'প্রশংসা পাঁওয়াটা একটা তাৎক্ষণিক পুরস্কার যা ইহকালেই একজন মু'মিন ভবিষ্যতের জন্য শুভসংবাদ আকারে লাভ করে' [মুসলিম, কিতাবুল বিরর্ ওয়াস্ সিলাহ্]।

সুতরাং একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি কেউ পুণ্যকর্ম করে এবং তার প্রশংসা হয় তবে তার অর্থ এ নয় যে, ঐ ব্যক্তি অবশ্যই রিয়াকারী (লোক দেখানো আমল) করেছে। বরং আল্লাহ্‌তাআলাই মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট করেন। এ জন্য আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, পুণ্যবান ব্যক্তির প্রশংসা তার জন্য ইহকালের তাৎক্ষণিক পুরস্কার। পরকালের পুরস্কার সে পরকালে পৃথক পাবে।

'আল্ মু'মিন লিত্‌তিরানী বইয়ে আছে, "হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ কিছু মানুষকে অন্যদের অভাব প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে তাদের কাছে যায়, আর তারা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এমন লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিরাপদ থাকবেন।"

জামে' তিরমিযী গ্রন্থে আছে, "হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) এক যুবকের কাছে গেলেন, যে মৃত্যু পথযাত্রী ছিল, হুযূর (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? সে বলল, হুযূর ! আমি আল্লাহ্‌র কাছে মঙ্গলের আশা করছি। কিন্তু নিজ পাপসমূহের কারণে ভয়ও পাচ্ছি। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, এমন সময় [মৃত্যুর পূর্বক্ষণে] যার হৃদয়ের এ অবস্থা হয় অর্থাৎ আশা-প্রত্যাশা এবং ভয় উভয় কথা একত্র হয়, আল্লাহ্ নিশ্চয় তার আশা পূরণ করেন এবং তার ভয়কে দূর করে নিরাপত্তা প্রদান করেন' (তিরমিযী, কিতাবুল জানায়েয)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হতে চায় আল্লাহ্ ও তার সাথে মিলিত হতে চান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হতে চায় না আল্লাহ্‌ও তার সাথে মিলিত হতে চান না।" একথা শুনে আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হতে চায় না একথার অর্থ কী?' মিলিত হতে চায় না অর্থ এই যে, সে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পসন্দ করে না? (যদি তাই হয় তবে আমরা কেউই তো মৃত্যুকে পসন্দ করি না)। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, না, একথা নয়, বরং এর অর্থ এই যে, মু'মিনকে যখন আল্লাহ্‌র রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি এবং তাঁর জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়া হয় তখন সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকে পসন্দ করে। অতএব আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাৎকে পসন্দ করেন। কাফিরকে যখন আল্লাহ্‌র আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির খবর দেয়া হয় তখন সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকে পসন্দ করে না। ফলে আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাৎকে পসন্দ করেন না" [সহী মুসলিম; কিতাবুয্ যিক্‌রে ওয়াদ দুয়ায়ে]।

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী এবং হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) উভয়ে বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবেন তখন ঘোষণাকারী ফিরিশ্‌তা ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা সর্বদা সুস্থ-সবল থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবে না এবং চিরকাল জীবিত থাকবে, তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা কখনও বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা যৌবন উপভোগ করবে। তোমরা কখন অভাবগ্রস্ত হবে না। কখনও দারিদ্রে আক্রান্ত হয়ে ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না। তোমরা চিরদিন চিরসুখী হয়ে থাকবে।" আল্লাহ্‌র কালাম, **ওয়া নুদু আন তিলকুমুল্লা জান্নাতো উরিসতুমুহা বিমা কুনতুম তা'মালূন** [সূরাতুল 'আলাক্ব ঃ ৪৪] অর্থ ঃ তাদের ডেকে বলা হবে, এই সেই জান্নাত তোমাদিগকে যার ওয়ারীস বানানো হয়েছে তোমরা যা পুণ্য করে এসেছ তার বিনিময়ে" [সহী মুসলিম; কিতাবুল জান্নাত, তিরমিযী]।

হযরত আব্দুর রহমান বিন গানাম, আবূ মালেক আশআরী (রাঃ)-এর কাছ থেকে একটি দীর্ঘ বেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, একবার আঁ হযরত (সঃ) নামায শেষ করে লোকজনের কাছে আসলেন। তারপর হুযূর (সঃ) বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা শোন এবং স্মরণ রাখ। জেনে রাখ যে, কিছু লোক আছে যারা নবীও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকটে, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে তাদের অবস্থানকে দেখে নবীগণ ও শহীদগণও ঈর্ষা বা লোভ অনুভব করেন।

তারপর বহু দূর থেকে একজন (আরাবী) বেদুঈন এসে আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতি নিজ হাতে ইশারা করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! কিছু কিছু মানুষ এমনও আছেন যারা নবীও নয়, শহীদও নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র সাথে তাদের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা দেখে নবীগণ, শহীদগণও লোভ অনুভব করবেন। এদের সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে কিছু বলেন। ঐ আরাবীর এহেন প্রশ্ন শুনে হুযূর (সঃ)-এর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; হুযূর (সঃ) বললেন, "এরা এমন মানুষ যারা সমাজে বিখ্যাত ও পরিচিতি রাখে না। কোন নামকরা গোত্রের সদস্যও নয় তারা। এদের মধ্যে কোন বিশেষ আত্মীয়তাও থাকে না। কিন্তু তারা পরস্পর একে অপরের সাথে প্রেম-ভালবাসা রাখে। নিঃস্বার্থ সম্পর্ক, কোন জাগতিক স্বার্থের সম্পর্ক নয়, [কেবলই আল্লাহ্‌র খাতিরের সম্পর্ক] কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ নূরের মিম্বার রাখবেন। তাদেরকে ঐ মিম্বরের উপরে বসানো হবে। তাদের চেহারাকেও নূরান্বিত করে দেয়া হবে, তাদের পোশাকও নূরান্বিত করে দেয়া হবে। অন্যরা যেখানে সেদিন অত্যন্ত ভীতিপ্রদ অবস্থায় থাকবে সেখানে এরা কোন ভয় অনুভব করবেন না। এরা আল্লাহ্‌র এমন বন্ধু হবেন যাঁদের সেদিন কোন ভয় বা অনুশোচনা থাকবে না" (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের খবর দিয়েছেন। অতএব নিশ্চিত জানবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যেমন আমেরিকাতে ভূমিকম্প এসেছে, ইউরোপে এসেছে, তেমনই এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আসবে। কোন কোন ভূমিকম্প তো কিয়ামত সদৃশ হবে। এত বেশি প্রাণহানী ঘটবে যে, রক্তের ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। পশু-পাখীরাও মৃত্যু হতে রক্ষা পাবে না। ভূপৃষ্ঠে এত বড় রকম ধ্বংস নেমে আসবে যে, যেদিন থেকে এখানে মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন হতে এ দিন পর্যন্ত এত বড় ভয়ংকর প্রলয় কখনও ঘটে নি। অনেক বেশি অঞ্চল যের ও যবর [উলট পালট] হয়ে যাবে। যেমন সেখানে কখনও কোন জনপদ ছিলই না।

এ ছাড়াও আরো বহু প্রকার ধ্বংস নেমে আকাশ ও পাতালে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করবে। এমন অবস্থা হবে যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে ঐ অবস্থা অবশ্যই অসাধারণ অবর্ণনীয় অবস্থা বলেই গণ্য হবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের কোন কিতাবে এমন অবস্থার কোন উল্লেখ থাকবে না। তখন মানুষ খুবই অস্থিরতাবোধ করবে, বুঝতে পারবে না যে, কি ঘটতে যাচ্ছে? অনেকে তো উদ্ধার পাবে কিন্তু অনেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐদিন বেশী দূরে নয়। বরং আমি তো দেখছি যে, সেদিন একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে। পৃথিবীর মানুষ কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। কেবল ভূমিকম্পই নয় বরং আরো বিভিন্ন প্রকার ভয়াবহ বিপদ দেখা দিবে। কিছু আকাশ থেকে, আর কিছু ভূ-পৃষ্ঠ থেকে। এমন অবস্থা এ জন্য সৃষ্টি হবে যে, মানুষ নিজ খোদার ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে। মানুষ তার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রচেষ্টা সমস্ত চিন্তা ভাবনা কেবলমাত্র ইহকালের প্রতি নিবদ্ধ করেছে।

যদি আমি না আসতাম তবে হয়ত এসব বিপদ আসতে আরো কিছুকাল দেরী হ'ত। কিন্তু আমার আগমনের ফলে আল্লাহ্‌র ক্রোধ আল্লাহ্‌র অপ্রকাশিত ইচ্ছা দীর্ঘকাল থেকে গোপন ছিল-প্রকাশ পেয়ে গেছে। যেমন তিনি বলেছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

[অর্থ ঃ আমরা কোন জাতির উপর আযাব প্রেরণ করি না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে কোন রসূল প্রেরণ করি [বনী ইসরাঈল ঃ ১৭ঃ১৬]। হ্যাঁ, যারা তওবা করবে তারা নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করবে। যারা বিপদ আপতিত হবার আগেই ভয় পেয়ে যায় তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হবে। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা ঐ বিপদসমূহ থেকে নিরাপদ থাকবে, রক্ষা পাবে? অথবা তোমরা নিজের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার বলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে ? কখনও নয়। মানবীয় কর্মকান্ডের সেদিন সমাপ্তি ঘটবে। এ কথা মনে করবে না যে, আমেরিকায় বড় ভূমিকম্প এসে গেছে এবং তোমাদের দেশ নিরাপদে আছে। আমি দেখছি, হয়তবা তার চেয়েও বড় ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও, হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নও! হে দ্বীপবাসীরা! তোমাদের কোন কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি! আমি জনপদগুলোকে জনশূন্য দেখছি। এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘ দিন যাবৎ চুপ ছিলেন। তাঁর চোখের সামনে দৃষ্টিকটু কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। তিনি চুপ থেকেছেন। কিন্তু এখন তিনি তাঁর রুদ্রমূর্তি প্রদর্শন করবেন। যার কান আছে সে শুনে রাখুক, ঐ সময় দূরে নয়- আমি চেষ্টা করেছি সবাইকে আল্লাহ্‌র নিরাপদ আশ্রয়ে একত্র করার। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীরের লিখন পূর্ণতা পাওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। আমি সত্য সত্যই বলছি এদেশের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। নূহ্ (আঃ)-এর যুগের দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। লুত (আঃ)-এর ভূমির ঘটনা তোমরা স্বয়ং দেখবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব বড় ধীরে ধীরে আসে। তওবা কর যেন করুণা প্রদর্শন করা হয়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে কীট ছাড়া আর কি, সে মানুষ নয়। আর যে তাঁকে ভয় করে না সে মৃত, জীবিত নয়" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২তম খন্ড; পৃঃ ২৬৮)।

আজকাল যে যুগ আসছে, এটা তো ঐ সেই যুগ যার উল্লেখ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) করেছেন। এখানে বর্ণিত অবস্থার অনুরূপ অনেক ঘটনাই ঘটছে। অতএব খুব ভয়ের কারণ। কোন কোন নমুনা দেখে মনে হয় যে, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হবার কাছাকাছি। আল্লাহ্ ভাল জানেন যে, আমার ধারণা সঠিক না কি ভুল। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলো আমাদেরকে এদিকে নিয়ে যাচ্ছে যে, অনেক বড় বড় ভূমিকম্প অর্থ এমন মহাযুদ্ধ যার ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, জীবনের চিহ্ন মিটে যাবে। জীবনের চিহ্ন তো কেবল পরমাণু যুদ্ধের ফলে মিটতে পারে।

অতএব আল্লাহ্ ভাল জানেন, সে সময় কখন আসবে। দোয়া করুন ঐ সময়কে যেন আল্লাহ্ দূরে সরিয়ে রাখেন।

১৯০৬ইং ইলহাম ঃ (আরবী থেকে অনুবাদ) সকল মানুষ পালিয়ে যাবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তুমি আমাদের নিকট আজ সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত এবং নিরাপদ। তোমার উপর আমার রহমত দীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে সর্বদা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন আছে" (তাযকিরাহ্, পৃষ্ঠা ৬৩৪)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন। ১৫-২১ মার্চ ২০০২ইং থেকে সংগ্রহ)

অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্‌তাআলার 'আযীয' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৫ এপ্রিল, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) এ খুতবাটিও আল্লাহ্‌তাআলার সিফ্‌ত (গুণবাচক নাম) 'আল্-আযীয' সম্পর্কে ইরশাদ করতে গিয়ে শুরুতে সূরাতুল জুমুআর ২ ও ৩নং আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

অর্থ ঃ 'যা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহ্‌রই তসবীহ্ করে যিনি অধিপতি, পরম পবিত্র, সর্বময় প্রাধান্যের অধিকারী (ও) পরম প্রজ্ঞাবান। তিনিই (আল্লাহ্) যিনি উম্মী (নিরক্ষর লোক)-দের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল পাঠিয়েছেন, সে তাদের নিকট তাঁর আয়াত পড়ে শুনায়, তাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও (এর) হিকমত শিখায়; অথচ এরা আগে থেকেই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) ছিল। আর অন্যদের মাঝেও তাদেরই মধ্য থেকে (তিনি তাকে পাঠাবেন) যারা এখনও তাদের সাথে মিলে যায় নি। আর তিনি সর্বময় প্রাধান্যের অধিকারী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। তখন সূরাতুল জুমুআ যার মধ্যে **ওয়া আখারীনা মিনাহুম লাম্মা ইয়াল্‌হাকূ বিহিম** রয়েছে অবতীর্ণ হলো। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কে (যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হন নি?)' কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দেন নি, এমন কি সে তিনবার জিজ্ঞেস করলো। বর্ণনাকারী বলছেন, তখন সালমান ফারসীও আমাদের মাঝে ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, 'ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গেলেও তাদের মধ্য থেকে (পারশ্য বংশোদ্ভুত) এক বা একাধিক ব্যক্তি তা সেখান থেকে নামিয়ে আনবে" (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রাঃ) বলেন, "যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছিলেন, 'খায়রুল কুরূনি ক্বারনী' (আমার শতাব্দী সবচেয়ে উত্তম শতাব্দী) তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীকেও খায়রুল কুরূন (সবচেয়ে উত্তম শতাব্দী) বলেন। এরপর বলেন, 'সুম্মা ইয়াফ্‌শুল কাযিব' (অতঃপর মিথ্যা ছড়িয়ে

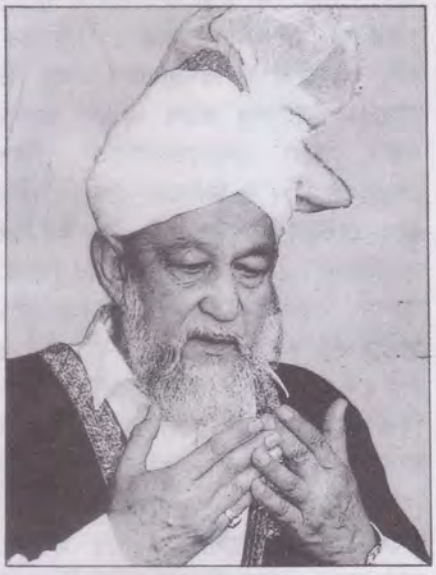

পড়বে)। অতএব কোন অজ্ঞ ও সুন্নত সম্পর্কে অজানা কেউ বলতে পারে যে, তাঁর (সঃ) পবিত্রকরণ শক্তি নাউযুবিল্লাহ্ এতো দুর্বল ছিল যে, তিন শতাব্দীর পরে আর প্রভাবশালী থাকে নি। কাজেই ওরূপ জ্ঞানান্ধদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম** (অর্থাৎ) তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি এরূপ প্রভাবশীল ও কার্যকর যে, তেরশ' বছর পরও পবিত্র করতে পারে। সুতরাং **আল্লাহ্‌তাআলা ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম**-এর ওয়াদা করলেন, অর্থাৎ আরও একটি জাতি শেষ যুগে আসবে যারা সরাসরি নবী করীম (সঃ)-এর কাছ থেকে কল্যাণ ও আশিস লাভ করবে, আর আল্লাহ্ (তখন) একবার এই রসূলকে (সঃ) বরুযীরূপে আবির্ভূত করবেন। এ আবির্ভাবটিও **ফিল উম্মিঈনা রসূলান**'-এর সময় যা ছিল তার অনুরূপ ও সম রঙে রঙিন হবে। সহী হাদীসাবলীতে প্রমাণিত যে, এ উম্মতের কাজ-কর্ম আঁ হযরত (সঃ)-কে পৌছানো (জানানো) হয়। অতএব ভেবে দেখ, তখন কী রকম তাঁর উদ্বেগ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকবে যখন তাঁকে জানানো হয় যে, এ ধরনের সব মনগড়া কথায় ও টীকা-টিপ্পনীতে (তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শকে) ঢেকে দেয়া হয়েছে, যার দরুন সত্য বিষয়কে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে আর ঐ সব কথা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে, ইসলামের সঙ্গে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক ও সংশ্রব ছিল না। কাজেই আল্লাহ্‌তাআলা বলেন যে, ঐ শিক্ষককে তিনি পুনরায় পাঠিয়ে দিবেন যাঁর আবির্ভাব 'ফিল উম্মিঈন' হয়েছিল, পুনর্বার তাকে (ফিল আখারীন) আবির্ভূত করবেন এবং তাঁর (আত্মিক) মনোযোগ তাদের ওপর নিবদ্ধ করাবেন, যারা **লাম্মা ইয়াল্‌হাকূ বিহিম**-এর প্রতীক হবে- যারা এখন নেই, পরবর্তীতে এসে (মিলে) যাবে"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "সেই আল্লাহ্ যিনি করীম ও রহীম তিনি উম্মী (নিরক্ষর লোক)-দের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এমন এক কামেল (পূর্ণাঙ্গ) রসূলকে পাঠিয়েছেন যিনি (নিজে) উম্মী হওয়া সত্ত্বেও খোদার আয়াতসমূহ তাদের নিকট পড়েন ও তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও (এর) হিকমত শিখান, যদিও এ নবীর আবির্ভাবের পূর্বে তারা সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় আবদ্ধ ছিল। আর তাদেরই শ্রেণীর মধ্য থেকে অন্যান্য দেশের লোকও রয়েছে যাদের ইসলামে প্রবেশ করা অবধারিত করা হয়েছে, কিন্তু এখনও তারা মুসলমানদের সাথে (এসে) মিলিত হয় নি। খোদা সর্বময় প্রাধান্যের অধিকারী, পরম

প্রজ্ঞাবান। তাঁর অনুগ্রহ হিকমতবিহীন নয় অর্থাৎ যখন ঐ সময় এসে যাবে যখন খোদা তাঁর পরিপূর্ণ হিকমত অনুযায়ী অন্যান্য দেশের থেকে যাদের মুসলমান হওয়া অবধারিত করেছেন তারা তখন ইসলামে প্রবেশ করবে।"

অতঃপর তিনি বলেন, "সেই খোদা যিনি রহীম তিনি উম্মীদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিখায় যদিও এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট বিপথগামী ছিল। আর তেমনি ঐ রসূল যে তাদেরকে (শিখাচ্ছে ও) তরবিয়ত দান করছে সে অন্য একটি দলকেও (শিখাবে ও) তরবিয়ত দান করবে যারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ও তাদেরই পূর্ণতাপ্রাপ্ত গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি (রপ্ত) করে নেবে। তবে ওরা এখনও তাদের সাথে (এসে) মিলিত হয় নি। আর খোদা সর্বময় প্রাধান্যের অধিকারী, পরম প্রজ্ঞাবান। এখানে এ তত্ত্বটি স্মরণ রাখা দরকার যে, **ওয়া আখারীনা মিনহুম** আয়াতটিতে **আখারীন** শব্দটি মাফউলের (কর্মবাচক) অবস্থানে রয়েছে বিধায় সম্পূর্ণ আয়াতটিতে সন্নিবেশিত শব্দগুলোর অর্থ এরূপ দাঁড়ায় ঃ **হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মীঈনা রসূলাম্ মিনহুম ইয়াত্লু আলায়হিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কীহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল্ হিকমাতা ওয়া ইউআল্লিমুল্ আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্হাকু বিহিম'** অর্থাৎ সাহাবাদের ছাড়াও আমাদের পূর্ণতাপ্রাপ্ত অন্য আরও বান্দা আছে যাদের বিপুল সংখ্যক একটি দল আখেরী জামানায় সৃষ্টি হবে এবং নবী করীম (সঃ) যেমন সাহাবা (রিজওয়ানুল্লাহি আলায়হিম)-কে তরবিয়ত (ও শিক্ষা) দিয়েছিলেন তেমনি এ দলটিকেও অভ্যন্তরীণরূপে তরবীয়ত (ও শিক্ষা) দান করবেন। অর্থাৎ তারা এমন এক যুগে হবে যে যুগটিতে বাহ্যিকভাবে ঐশীকল্যাণ আহরণ ও বিতরণের সিলসিলাহ্ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ইসলামধর্ম বহু ভুল-ভ্রান্তি ও বি'দাতের শিকার হয়ে যাবে আর আধ্যাত্মিক সাধকদের অন্তর থেকেও অভ্যন্তরীণ আলো দূর হয়ে যাবে। তখন খোদাতাআলা একজন পুণ্যাত্মাকে বাহ্যিক কোন সিলসিলাহ্র ওসীলা (মাধ্যম) ব্যতিরেকে কেবল নবী করীম (সঃ)-এর আধ্যাত্মিকতার তরবিয়তের দ্বারা রূহানী কামালীয়ত ও পূর্ণত্বে পৌঁছে দিবেন ও তার একটি বিপুলসংখ্যক দল বানাবেন। সে দলটির সাহাবা-এ-কিরাম (রিযওয়ানুল্লাহি আলায়হিম)-এর দলের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় সাদৃশ্য সৃষ্টি করবেন যে, তার সবটাই আঁ হযরত (সঃ)-এরই চাষ হবে ও তাঁরই ফয়েয ও কল্যাণ-ধারা তাদের মাঝে বহমান হবে, আর তারা সাহাবা (রিযওয়ানুল্লহি আলায়হিম)-এর সাথে মিলিত হবে, অর্থাৎ নিজেদের কামালাতের (গুণ ও বৈশিষ্ট্যের) দিক দিয়ে তাঁদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে এবং খোদার কৃপায় ও তাঁর অনুগ্রহে তারা সওয়াব ও পুণ্যে ঐ যাবতীয় সুযোগ পাবে যা সাহাবা-এ-কিরাম পেয়েছিলেন। আর নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তার এবং (তা সত্ত্বেও) নিজেদের অটল অবিচল থাকার দরুন তারা খোদাতাআলার দৃষ্টিতে সেভাবেই সত্য ও নিষ্ঠাবান বলে বিবেচিত হবে যেভাবে সাহাবা-এ-কিরাম বিবেচিত হয়েছিলেন। কেননা এ যুগটি বহু বিপদ-আপদ, ফেত্না-ফাসাদ ও বে-ঈমানীর ছড়িয়ে পড়ার যুগ হবে। আর সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান লোকেরা ঐ সকল সংকট ও বাধা-বিপত্তিরই সম্মুখীন হবেন যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সাহাবা-এ-কিরাম। সেজন্য তারা (সত্যের পথে) দৃঢ়তা দেখানোর পর সাহাবা (রিযওয়ানুল্লাহি আলায়হিম)-এর মর্যাদায় গণ্য হবেন। কিন্তু (বিগত) মধ্যবর্তী যুগটি হ'ল (হাদীস বর্ণিত) 'ফায়জে আওয়াজ' (বক্রযুগ), সে যুগে ইসলামের (জাগতিক) প্রতাপ ও শান-শওকত ছড়িয়ে পড়ার এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যজনিত ভোগ-বিলাস বেড়ে যাওয়ার দরুন সাহাবা-এ-কিরামের (রাঃ) সাথে পা মিলিয়ে চলেন ও আংশিকভাবে তাঁদের মর্যাদাকে অর্জন করেন এমন লোকদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু আখেরী যুগটি হবে আউওয়াল (প্রাথমিক) যুগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা এ যুগের লোকদের ওপর দারিদ্র ছেয়ে পড়বে ও ঈমানী শক্তি ছাড়া বালা-মুসিবতের বিরুদ্ধে তাদের অন্য কোন উপায়-উপকরণ হবে না। তাদের ঈমান খোদার দৃষ্টিতে এরূপ মজবুত ও দৃঢ়তাপূর্ণ হবে যে, ঈমান যদি আকাশেও উঠে যায় তবু তারা তা পৃথিবীতে নামিয়ে আনবে। অর্থাৎ তাদেরকে ভূমিকম্পের ন্যায় আলোড়িত করা হবে, তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে, সব রকমের ফেতনা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে কিন্তু তারা এমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সাব্যস্ত হবে যে, ঈমান নভোমন্ডলে থাকলেও তবু তারা তা ছেড়ে দিতো না। অতএব তারা ঈমান আকাশের উপর থেকেও নিয়ে আসতো এ প্রশংসা এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, তারা এমন একটি যুগে আসবে যখন চারদিকে বে-ঈমানী বা ঈমানশূন্যতা ছড়িয়ে থাকবে, খোদাতাআলার খাঁটি ও সত্যিকার ভালবাসা (মানুষের) অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তাদের ঈমান তাদের অন্তরে বড়ই জোরে শোরে কাজ করবে। খোদার জন্য বিপদের মুখে তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতার অনেক শক্তি হবে এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তাও চূড়ান্ত মাত্রায় হবে। কোন ভয়-ভীতিও তাদের জন্য বাধা হবে না, কোন জাগতিক (বা সাংসারিক) দুঃখ-দুর্ভাবনাও তাদেরকে দমাতে পারবে না। ঈমানী শক্তির এ সকল বিষয় দ্বারাই পরীক্ষা করা হয় যাতে ওরূপ পরীক্ষার সময় ঈমান শূন্যতার যুগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সাব্যস্ত হয়।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "শেষ যুগের আদমের জন্য প্রকৃতপক্ষে মুরব্বী ও অভিভাবক হচ্ছেন আমাদের নবী করীম (সঃ)। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সম্পর্ক মাত্র। আর এরই দিকে ইঙ্গিত করছে খোদাতাআলার বাণী ঃ **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্হাকূবিহিম**। অতএব **আখারীন** শব্দটিতে গভীর চিন্তা কর। খোদাতাআলা আমার উপর এ মহামান্বিত রসূলের ফয়েয (কল্যাণ প্রসাদ) অবতীর্ণ করেছেন ও একে পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং এ নবী করীমের (সঃ) অনুগ্রহ ও বদান্যতাই আমাকে আকর্ষণ করেছে এমন কি, আমার অস্তিত্ব (তাঁতে বিলীন হয়ে) তাঁর অস্তিত্ব হয়ে গেছে। অতএব হে যারা আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত! তোমরা প্রকৃতপক্ষে আমার সর্দার ও প্রভু খায়রুল মুরসালীন (সঃ)-এর সাহাবাদের (রাঃ) অন্তর্গত। **ওয়া আখারীনা মিনহুম** কথার এটাই অর্থ, যা চিন্তাশীলদের

নিকট গোপন নয়। যে কেউ আমাকে মুস্তাফা (সঃ) থেকে ও তাঁকে আমা থেকে পৃথক করে, সে আমাকে দেখে নি, চিনে নি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, "এস্থলে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। তা এই যে, আল্লাহ্তাআলা যেমন আয়াতটির দৃশ্যতঃ শব্দগুলোতে **ওয়া আখারীনা মিনহুম**-এর যে শব্দ ব্যবহার ক'রে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সাহাবা-এ-কিরামের কামালাত- উত্তমগুণাবলীর রঙে যারা আত্মপ্রকাশ করবেন তারা আখেরী যুগে হবেন। আর তেমনি **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূবিহিম** আয়াতের বর্ণনাবলীর (আরবী ভাষায় আবজাদের নিয়ম অনুযায়ী) সংখ্যামান যা ১২৭৫ দাঁড়ায় তা এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, যিনি **আখারীনা মিনহুম**-এর (পূর্ণতার) প্রতীক পারস্য বংশোদ্ভুত মহাপুরুষ তিনি এ সনটিতেই তাঁর বাহ্যিক বয়ঃক্রমে প্রাপ্তবয়সে পৌঁছার সময়কে পুরো করবেন আর আত্মিক উন্নতিক্রমে সাহাবাদের তুল্য হওয়াকেও। ১২৭৫ হিজরী সনটি, যা **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম**-এর বর্ণনাবলীর সংখ্যা থেকে প্রকাশ পায় তা বাহ্যিকভাবে এ অধমের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার এবং আধ্যাত্মিকভাবে তার দ্বিতীয় জন্মলাভের তারিখ বটে।'

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'খুতবা ইলহামীয়া'তে বলেন ঃ "আল্লাহ্তাআলা আমার প্রতি ওহী পাঠিয়ে বলেন ঃ 'কুল্লু বারাকাতিম্ মিম্মুহাম্মাদিন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ফা-তাবারাকা মান আল্লামা ওয়া তাআল্লামা'- সকল বরকত ও আশিষ মুহাম্মদ (সঃ) থেকেই; নবী করীম (সঃ) তাঁর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব সম্পাতে তোমাকে শিখালেন এবং তাঁর রহমত ও কৃপার ফয়েয ও কল্যাণ-ধারা তোমার হৃদয় ভান্ডারে ঢেলে দিলেন, যাতে তোমাকে তিনি তাঁর সাহাবা (রিযওয়ানুল্লাহি আলায়হিম)-এর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তোমাকে তাঁর বরকতে ও কল্যাণে শামিল করেন। আর যেন **ওয়া আখারীনা মিনহুম** সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণের কল্যাণ ও কথা তাঁর অনুগ্রহ ও ইহ্সান দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরও একটি উদ্ধৃতি ঃ (তিনি বলেন,) 'এরা (বিরুদ্ধবাদীরা) 'জাম্আ বাইনাস্ সালাতাইন' (দু'ওয়াক্তের নামায জম্আ বা একত্র করা-এর বিষয়ে তো কাঁদা-কাটি করে বেড়ায়, অথচ প্রতিশ্রুত মসীহ্র ভাগ্যে তাছাড়াও অনেকগুলো একত্রকরণের ব্যাপার রাখা আছে। (যেমন) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের একত্রে হওয়া যা নিদর্শনস্বরূপ হওয়া নির্ধারিত ছিল। **ওয়ান্ নুফূসু যুওয়েজাত্** (যখন দুনিয়া জুড়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে একত্র করে দেয়া হবে - অনুবাদক) আমারই জন্য হয়েছে। আর **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্হাকূ বিহিম**- এও একটি একত্রকরণই বটে। কেননা আওওয়াল (প্রথম) ও আখেরকে মিলানো হয়েছে। এটা সেই মহামর্যাদাপূর্ণ জম্আ (জমা) বা একত্রীকরণ, যা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বরকত ও আশিস ও কল্যাণ প্রবহমানতার স্বপক্ষে দলিল ও সাক্ষীস্বরূপ। তারপর এ-ও জম'আ যে, খোদাতাআলা তবলীগের যাবতীয় উপায়-উপকরণ একত্র করে দিয়েছেন। সুতরাং মুদ্রণ ব্যবস্থার সুবিধাদি, কাগজের প্রাচুর্য, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, রেল ও জাহাজের মাধ্যমে সারা পৃথিবী একটি শহরের রূপ ধারণ করে ফেলেছে তদুপরি নিত্যনূতন আবিষ্কারগুলো এই জম'আ ও একত্রীকরণকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। কেননা তবলীগ ও তথ্যপ্রচারের উপকরণ জমা হয়েছে এবং ফনোগ্রামের মাধ্যমেও তবলীগের কাজ নেয়া যেতে পারে। এর দ্বারা অনেক অদ্ভুত কাজ বেরুতে পারে। তারপর খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকার ইজতিমা সমাবেশ ও মিলন। মোট কথা, তবলীগের এতো উপায়-উপকরণ একত্র হয়ে গেছে যে, এর দৃষ্টান্ত অন্য কোন যুগে আমরা খুঁজে পাই না। বরং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি ছিল 'তাক্মীলে দীন'(ধর্মের পরিপূর্ণতা সাধন)-ও। এ সম্পর্কেই ঘোষণা করা হয় ঃ **আল্ ইয়ওমা আক্মাল্তুলাকুম দীনাকুম ওয়া আত্মাম্তু আলায়কুম নে'মাতী ওয়া রাযীতু লাকুমুল্ ইস্লামা দীনা** (সূরাতুল মায়েদা ঃ ৪)

এখন ঐ পরিপূর্ণ করার ভেতর দু'টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক ছিল। একটি হচ্ছে হেদায়াতের পরিপূর্ণতা এবং দ্বিতীয়টি হেদায়াতের প্রচার ও বিস্তারের পরিপূর্ণতা। হেদায়াতের পূর্ণতা সাধনের যুগ তো রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিজের প্রথম যুগটি ছিল। আর হেদায়াতের প্রচার ও বিস্তারের পূর্ণতা সাধনের হচ্ছে তাঁর সেই দ্বিতীয় যুগটি, যখন **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্হাকূ বিহিম** সংক্রান্ত সময়টি আসন্ন ছিল। আর সে সময়টি হচ্ছে এখন অর্থাৎ আমার যুগ, অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদের যুগ। সেজন্য আল্লাহ্তাআলা হেদায়াতের পূর্ণতা সাধন ও হেদায়াতের প্রচার ও বিস্তারের পূর্ণতা সাধনের যুগ দু'টিকেও এভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর এ-ও মহামর্যাদাপূর্ণ এক মিলন ও একত্রিকরণ।"

"আল্লাহ্তাআলা আপন পবিত্র কালামে আঁ হযরত (সঃ)-এর কারও পিতা হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, পক্ষান্তরে তাঁর বুরুযের সংবাদ দিয়েছেন। যদি বুরুয ঠিক না হতো তাহলে **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্ হাকূবিহিম**-

আয়াতটিতে প্রতিশ্রুত পুরুষের সহচরগণকে আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবার শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে কেন? কাজেই বুরুযকে অস্বীকার করলে এ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হবে।

আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে মাহ্দীর সম্পর্ককে যারা দৈহিক বলে মনে করেন, তাদের কেউ বলেছেন মাহদী হাসান বংশীয় হবেন, কেউ বলেছেন হুসায়েন বংশীয় হবেন এবং কেউ বলেছেন আব্বাস বংশীয় হবেন। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর কেবল এ উদ্দেশ্য ছিল যে তিনি সন্তানের ন্যায় তাঁর ওয়ারীস হবেন, যথা তাঁর নামের, তাঁর গুণের, তাঁর জ্ঞানের, তাঁর আধ্যাত্মিকতার এবং সবদিক দিয়ে তিনি নিজের মধ্যে তাঁর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখাবেন। নিজের পক্ষ হতে নয়, পরন্তু সব কিছু তিনি তাঁর নিকট হতে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁরই চেহারা দেখাবেন। সুতরাং যেমন বুরুযীভাবে তিনি তাঁর নাম, তাঁর গুণ, তাঁর জ্ঞান নিবেন, তেমনি তাঁর নবী উপাধিও গ্রহণ করবেন। কারণ বুরুযী ছবি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ছবি সব দিক দিয়ে আপন আসলের পূর্ণতা প্রকাশ করে। সুতরাং নবুওয়ত যেহেতু নবীর মধ্যে একটি গুণ অতএব বুরুযী ছবির মধ্যেও উক্ত গুণের

বিকাশ হওয়া আবশ্যক। সব নবী একথা স্বীকার করে এসেছেন যে, বুরুযী ব্যক্তি মূল ব্যক্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। এমন কি নাম পর্যন্ত এক হয়ে যায়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় এটা সুস্পষ্ট যে, যেমন বুরুযীভাবে মুহাম্মদ (সঃ) এবং আহমদ (সঃ) নাম রাখলে দুই মুহাম্মদ (সঃ) এবং দুই আহমদ (সঃ) হন না, তদ্রূপ বুরুযীভাবে নবী ও রসূল বললে খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভাঙ্গে না। কারণ বুরুযী সত্তা কোন পৃথক সত্তা নয়। এরূপ হলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামের নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সব নবী একমত যে, বুরুযের মধ্যে দ্বৈততা থাকে না। কারণ বুরুযের মর্যাদা নিম্ন বর্ণিত রূপ হয়ে থাকেঃ

'মান তু শুদাম তু মান শুদি মান তান শুদাম তু জাঁ শুদি
কাসে না গোয়েদ বা'দ আযিঁ মান দীগরম তু দীগরি'

-'আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি;
আমি হলাম দেহ, তুমি হলে প্রাণ;
পরে যেন না বলে কেউ, আমি এক তুমি অন্য।'

কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয় বার আগমন করলে, খাতামান্নাবীঈনের মোহর না ভেঙ্গে তিনি পৃথিবীতে কীভাবে আসবেন?"

সূরাতুত্ তাগাবুন-এর ১৯তম আয়াত ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ ঃ (তিনিই) অদৃশ্য ও দৃশ্যের চিরস্থায়ী জ্ঞান ও সর্বময় প্রাধান্যের অধিকারী, পরম প্রজ্ঞাবান।

সূরাতুল্ মুল্ক-এর ৩নং আয়াত ঃ

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝

অর্থ ঃ তিনিই (আল্লাহ্) যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে সৎকর্মের দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম। আর তিনিই মহাসম্মান ও সর্বময় প্রাধান্যের অধিকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রাঃ) বলেন, "খোদাতাআলা মরণ ও জীবনকে বানিয়েছেন (সৃষ্টি করেছেন), এ দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া, তারপর হামেশা জীবিত থাকা (যেন এ উদ্দেশ্যে সফল হয়)। মানুষের ভেতর যে জিনিসের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা আছে তার উপকরণও অবশ্যই মজুদ থাকে। সে যেন বিলীন ও নিঃশেষ হয়ে না যায় এটা মানুষের স্বভাবজ আকাঙ্ক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আল্লাহ্ এর বিহিত ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। মরে যাওয়ার পরও মানুষ কায়েম (টিকে) থাকে। আল্লাহ্ মৃত্যুও বানিয়েছেন। এ-ও তাঁর বড়ই গরীব-প্রীতি। মৃত্যুর সাথে সাথে তার দুনিয়ার সব দাবী ও চাহিদা নিঃশেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর আবার উন্নতির যুগ শুরু হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলতেন, মৃত্যু মানুষের জন্য তেমনই আবশ্যকীয় যেমন প্রত্যেক মেয়ে সন্তান যে কারও ঘরে জন্ম হয় তার জন্য এটা আবশ্যকীয় যে, তার মা-বাবা পরম স্নেহে পেলে পুষে সব রকমে তাকে শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তুলে অবশেষে একদিন তাকে যেন তার বাড়ী থেকে বিদায় দিয়ে তার (স্বামীর) বাড়ীতে পৌছে দেয় কেননা তার মধ্যে আল্লাহ্তাআলা এক সুপ্তগুণ রেখেছেন যা তার এ ঘর ছেড়ে দিয়ে ঐ ঘরে চলে যাওয়া ব্যতিরেকে বিকশিত হ'তে পারে না, যদিও কিনা তার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন তার বিদায়ের দরুন দুঃখে ভরে যাক্ ও কেঁদে বুক ভাসাক তবু তাকে তাদের বিদায় করা আবশ্যকীয়। যেমন সে মুহূর্ত বড়ই কঠিন হয়ে থাকে তেমনি মৃত্যুর সাথে জড়িত বিদায়ও কঠিন। কিন্তু এরপর আরাম ও আনন্দের এক নতুন যুগ শুরু হয়।

এই 'মওত' ও 'হায়াত' শব্দে আঁ হযরত (সঃ)-এর সময়ে মানব গোষ্ঠীর যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল আর তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার গোটা মানবজাতির উপরই যে রূহানী নির্জীবতা ছেয়ে পড়েছিল- জল-স্থল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সে দিকেই কুরআন করীমের আরেক জায়গায় এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ **ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানুস্তাজীবূ লিল্লাহি ওয়াররসূলি ইযা দা'আকুম লিমা ইউহ্য়ীকুম**, অর্থাৎ হে মুমিনরা! আল্লাহ্ ও রসূলের কথা মান, যখন কিনা তিনি তোমাদেরকে ডাকেন যাতে তোমাদেরকে জীবন দান করেন।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউওয়াল (রাঃ) বলেন, "ইম্তিহান" (পরীক্ষা) শব্দের অর্থ হচ্ছে কারও কাছ থেকে মেহ্নত (পরিশ্রম) গ্রহণ করে তাকে মজুরী দান করা। কুরআন করীমে আল্লাহ্তাআলা বলেন, **উলাই-কাল্লা যীনামতাহানাল্লাহু কুলূবাহুম লিত্তাক্ওয়া লাহুম মাগফিরাতুঁ ওয়া 'আজরুন 'আযীম**, অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা তাদের হৃদয়কে তাক্ওয়ার জন্য এক পরীক্ষায় ফেললেন, তাতে তারা সফল হলো আর মাগ্ফিরাত ও মহাপুরস্কার লাভ করলো। 'আযীয' মানে প্রিয় ও সুন্দর কথাকে যিনি ভালবাসেন, সর্বময় প্রাধান্যের ও বড়ই সম্মানের অধিকারী এবং বান্দাদের ভুল-চুক হলে তারা যদি **ইস্তিগ্ফার** করে তাহলে তাদেরকে যিনি ক্ষমা করেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, "দুনিয়ার সফলতা কোনটাই পরীক্ষা ছাড়া হয় না। কুরআন করীমে বলা হয়েছে ঃ **খালাকাল্ মওতা ওয়াল হায়াতা লি ইয়াব্লুওয়াকুম** অর্থাৎ মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। সফলতা ও বিফলতা জীবন ও মৃত্যুর কারণ হয়। কৃতকার্যতা এক প্রকারের জীবন হয়ে থাকে। যখন কারও নিকট তার কৃতকার্য হবার খবর পৌছায় তখন তার ভেতর প্রাণ এসে যায় (সে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে) যেন নূতন জীবন পায়। যদি অকৃতকার্যতার খবর আসে তাহলে জীবিত থেকেও মরে যায়। অনেক সময় বহু দুর্বলচিত্তের লোক একেবারে ধ্বংসও হয়ে যায়।'

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এখন, এই সবগুলো ধর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পর অন্তরের সততার সাথে বল, ইসলাম ছাড়া কি অন্য কোন পথ আছে যাতে তোমাদের হৃদয় (প্রশান্তি লাভে) স্নিগ্ধ হতে পারে? দেখ, আর মনোযোগ দিয়ে শুন! তা কেবল ইসলামই সরাসরি বরকত ও আশিসের অধিকারী যা মানুষকে নিরাশ ও ব্যর্থ হতে দেয় না। এর প্রমাণ হচ্ছে যে, আমি (নিজে) এর বরকত ও আশিষ এবং জীবন ও সত্যতার দৃষ্টান্ত ও নমুনা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছি। এমন কোন খ্রীষ্টান নেই, যে আসমানের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে তা

দেখাতে পারে। আমি আমার জোরালো নিদর্শনাবলী দ্বারা সাফ সাফ দেখিয়ে দিয়েছি যে, জীবন্ত আশিস ও জীবন্ত নিদর্শন একমাত্র ইসলামেরই আছে। আমি অসংখ্য ইশ্‌তিহার দিয়েছি, আর একবার ষোল হাজার ইশ্‌তিহার ছেপে বিলি করেছিলাম। এখন এ লোকদের হাতে এটা ছাড়া আর কিছুই নেই যে, তারা মিথ্যা মকদ্দমা করেছে ও কতলের মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে (সাধ্যমত) আমাকে লাঞ্ছিত করার পরিকল্পনা এঁটেছে। কিন্তু আযীয (মহা পরাক্রমশালী) খোদার বান্দা কী ক'রে লাঞ্ছিত হতে পারে? যখন যেখানেই তারা আমার লাঞ্ছনা চেয়েছে সেখানে লাঞ্ছনার পরিবর্তে আমার সম্মান বেরিয়ে এসেছে। **যালিকা ফযলুল্লাহে ইউতীহি মাইঁইয়াশাউ**। দেখ! যদি (পাদ্রী) ক্লার্কের মকদ্দমা না হতো তাহলে 'ইব্‌রা' (সসম্মানে অভিযোগ মুক্ত করা) সংক্রান্ত ইল্‌হাম কী ক'রে পুরো হতো যা মকদ্দমার পূর্বে শতশত মানুষের মাঝে ছেপে দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল? কেবল ইসলামই সে ধর্ম যার সাথে অলৌকিক নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি রয়েছে। ইসলাম অপর কোন প্রদীপের মুখাপেক্ষী নয় বরং নিজেই (জ্বলন্ত) প্রদীপ, এবং এর প্রমাণাদি এতো উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট যে, এর দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে নেই। মোটকথা, ইসলামের এমন কোন শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যাবে না যার (ফলিত) দৃষ্টান্ত ও নমুনা না থাকে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামাতঃ

মিয়া মুহাম্মদ দীন মগফুর (রাঃ) ও মুন্‌শীয় মুহাম্মদ-দীন ওয়াসেল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি ইলহাম হয় ঃ **ইন্নি আ'রাযতু ওয়া আক্‌রামতু ওয়া ইউসিররুনী কওলুকা ইন্নি আল্লামতু**। অর্থাৎ আমি (তোমাকে) সম্মান দান করেছি, তোমার কথা আমার বড়ই পসন্দ হয়েছে, আমি তোমাকে শিখিয়েছি।

তারপর ১৯০০ইং সালের ইলহাম **ইন্নি হাশিরু কুল্লি কওমিই ইয়া'তুনাকা জুনুবান ওয়া ইন্নি আনারতু মাকানাকা। তান্‌যীলুম্ মিনাল্লাহিল্ আযীযির রহীম বালাজাত আয়াতী ওয়া লাইঁ ইয়াজ্ আলিল্লাহু লিলকাফিরীনা আলাল মু'মিনীনা সাবীলা**। অর্থাৎ আমি প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে দলে দলে লোক তোমার নিকট পাঠাব। আমিই তোমার ঘরকে উজ্জ্বল করেছি। এটা সেই আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) যিনি আযীয ও রহীম। যদি কেউ বলে, এ যে খোদার কালাম তা আমরা কী করে জানবো, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে এর এই আলামত যে, এই বাণী (কালাম) নিদর্শনাবলী সহ অবতীর্ণ হয়েছে। আর কাফিরদেরকে আল্লাহ্ মু'মিনদের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যি কোন আপত্তি করার কোন সুযোগ দিবেন না।

১৯০০ইং সালের ইলহাম ঃ **কুল ইনিফ্‌তারাইতুহু ফা-আলাইয়া আজরামী ওয়া মান আযলামু মিম্‌মানিফ-তারা আলাল্লাহি কাযিবান, তানযীলুম্ মিনাল্লাহিল আযীযির রহীম লিতুন্‌যিরা কাওমাম্মা উনযিরা আবাউহুম ওয়া লিতাদ্‌উওয়া কওমান আখারীন**। অর্থাৎ তুমি বলে দাও, আমি যদি মিথ্যা বানিয়ে থাকি তাহলে এর অপরাধ (শাস্তি) আমার ওপর বর্তাবে অর্থাৎ আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু তার চেয়ে বেশি যালেম আর কে হতে পারে যে খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা বানায়? এ কালাম (কথা) খোদার পক্ষ থেকে (এসেছে), যিনি আযীয ও রহীম, যাতে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর যাদের বাপ-দাদাদেরকে সতর্ক করা হয় নি, আর এজন্যও যে, অন্যান্য জাতিকে যেন দীনের দাওয়াত দাও। ১৯০১ইং সনের আরেকটি ইল্‌হাম ঃ **লা তা'জাবাল মিন আনী ইন্না নুরীদু আন নুয়িয্‌যাকা ওয়া নাহ্‌ফাযাকা** - অর্থাৎ আমার শান ও মর্যাদায় তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সম্মান দান করতে চাই এবং তোমার হিফাযত করতে চাই।

১৪ আগষ্ট ১৯০৩ সনের ইলহাম ঃ **ইয়া সীন ওয়াল কুরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন আলা সিরাতিম মুস্‌তাক্বীম তানযীলাল আযীযির রহীম**। অর্থাৎ হে সর্দার! হিকমতপূর্ণ কুরআন এ কথার সাক্ষী যে, তুমি খোদা প্রেরিত পুরুষ এবং সত্যপথে রয়েছে। এর নযূল হচ্ছে তাঁরই পক্ষ থেকে, যিনি মহাপরাক্রমশালী বার বার কৃপাকারী।

জানুয়ারী ১৯০৩ সালের ইলহাম ঃ কাম্মালাল্লাহু ইযাযাকা অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা তোমার সম্মান ও মর্যাদাকে পরিপূর্ণ করেছেন অথবা পরিপূর্ণ করবেন।

১৯০৫ সালের ইলহাম ঃ **আতালাল্লাহু বাকায়াকা কাম্মালাল্লাহু ইযাযাকা ওয়া তাউওয়ালাল্লাহু উমারাকা**- অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী- আল্লাহ্ তোমাকে (স্থিতিশীল রাখুন ও তোমার সম্মান-মর্যাদাকে পরিপূর্ণ করুন এবং তোমার আয়ু বাড়িয়ে দিন। অতঃপর ১৯০৫ সালের একটি ইল্‌হাম ঃ **কুল্ ইন্নাল্লাহা আযীযুন যুল ইক্‌তিদার আ-ফাতুঁমিনূন**- অর্থাৎ বলে দাও, আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, ক্ষমতাবান, অতএব তোমরা কি ঈমান আন না?

১৯০৬ সালের ইল্‌হাম ঃ **ইয়াসীন ইন্নাকা লামিনাল মুরসালীন আলা সিরাতিম্ মুস্‌তাক্বীম তানযীলাল আযীযির রহীম আরাদ্‌তু আন আস্‌তাখ্‌লিফা ফা খালাক্‌তু আদামা ইউহ্‌ইদ্ দীনা ও ইউকীমুশ্ শারীয়াতা** অর্থাৎ হে সর্দার! তুমি খোদার প্রেরিত পুরুষ ও সঠিক পথে আছে সেই খোদার পক্ষ থেকে (তোমাকে) অবতীর্ণ (করা হয়েছে) যিনি মহাপরাক্রমশালী, বার বার কৃপাকারী। আর আমি চেয়েছি এ যুগে আমার খলীফা নিযুক্ত করতে, অতএব আমি এ মানুষটিকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছি; সে দীনকে সঞ্জীবিত করবে এবং শরীয়তকে কায়েম ও কার্যকরী করবে।

তারপর ১৪ আগষ্ট ১৯০৭ তারিখে অবতীর্ণ ইলহাম ঃ **আজ হামারে ঘর পর পয়গম্বর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আ গায়ে-ইয্‌যাত ও সালামাতহ্** [অর্থাৎ আজ আমাদের বাড়ীতে পয়গম্বর (সঃ) এসে গেছেন; ইয্‌যত ও সালামাতি] ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ইং তারিখের ইল্‌হামসমূহ ঃ ১। আহ্‌বাবতু আন উ'রাফা- আমি চেয়েছি যেন আমাকে চেনা হয় (যেন আমি পরিচিত হই)।

২। **ইন্নি আনা রব্বুকার রহমানু যুল্ ইয্‌যে ওয়াস্‌সুলতান**- আমি তোমার রহমান (পরম করুনাময় অযাচিত-অসীম দানকারী) প্রভু-প্রতিপালক, সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রাধান্য ও আধিপত্যের অধিকারী।

(ধারণকৃত ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

অনুবাদ - **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৮-১২-০১ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ হুযূর, নিউইয়ক থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খুব কম বই-ই-ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর কারণ কি কোন ঐশী পরিকল্পনা না আমাদের উপযুক্ত অনুবাদকের অভাব?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা কোন ঐশী পরিকল্পনার কারণে নয়। আমাদের উপযুক্ত অনুবাদকের অভাব রয়েছে। তবে রাবওয়ায় চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেবের নেতৃত্বে একটি বোর্ড দিনরাত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বইয়ের অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আসল কথা হলো দক্ষ ও যোগ্য অনুবাদকের অভাব।

প্রশ্ন নং ২ ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন তাঁর বংশে যেন এক বড় নবীর আবির্ভাব ঘটে। আমরা বিশ্বাস করি, সেই দোয়ার ফলে আল্লাহ্তাআলা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আহলে কিতাবরা এটা মানে না। তারা বলে, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে এক মহান নবী ভবিষ্যতে আসবেন। আহলে কিতাবদেরকে কীভাবে মহানবী (সঃ)-এর সঠিক মর্যাদা সম্বন্ধে বুঝানো যায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আহলে কিতাবদের বলতে হবে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া পূর্ণতা লাভ করেছে। পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সেই দোয়ায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অনুরোধ করেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে যে নবী আবির্ভূত হবেন সেই নবী যেন মানুষদেরকে নিদর্শন দেখান কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং পবিত্র করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া সেখানে **ইউযাক্কিহিম** অর্থাৎ তাদেরকে পবিত্র করেন শব্দটি শেষে এসেছে আর নবী করীম (সঃ)-এর কথা কুরআনে যেখানে এসেছে **ইউযাক্কিহিম** শব্দ প্রথমে এসেছে। এটাই সঠিক ধারাবাহিকতা কেননা, তারা পবিত্র না হলে কুরআনের জ্ঞান ও হিকমত কীভাবে শিখতে পারবে?

প্রশ্ন নং ৩ ঃ ইসলাম ধর্মে মৃত দেহকে পোড়ানোর অনুমতি দেয়া হয় নি। এর কারণ কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মৃত দেহকে আগুনে পোড়ালে জাহান্নামের আগুনের দৃশ্য চোখের সামনে চলে আসে। তাই আল্লাহ্তাআলা মৃত দেহকে কবর দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ)-এর এক ছেলে তার ভাইকে মেরে ফেলেছিলো। পরে কাকের কাজ দেখে লজ্জায় সে তার মৃত ভাইকে কবর দেয়। আল্লাহ্র সব নবী মৃতদেহ কবর দিতেন। কাউকে পোড়ানো হয় নি। এটাই সুন্নাতুল্লাহ্ ও সুন্নতুল আম্বিয়া। আজকের খৃষ্টানরাও তা-ই করে আসছে।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ 'যাক্কুম' নামের গাছটি আসলে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কুরআন শরীফে এ নাম রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জাহান্নামে আক্ষরিক অর্থে কোন গাছ নেই যা জাহান্নামীদের খাবার জন্যে দেয়া হবে। এ পৃথিবীতে যাক্কুম নামে গাছ আছে। আমি স্পেনে এ গাছ দেখেছি। এটা দেখতে খুব সুন্দর ও এর ফলও খেতে স্বাদ লাগে। কিন্তু পরে পেটে জ্বালা করে ও এর প্রতিক্রিয়াও খারাপ এবং কষ্টদায়ক। হুযূর বলেন, পাপও এরকম। ইহা মানুষকে আকৃষ্ট করে ও মানুষ পাপ করে বসে। ফলে মানুষকে অনেক দুঃখ ও কষ্টে পড়তে হয়।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ "ক্রিসমাস ট্রি' বলতে কোন্ গাছকে বুঝায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আসলে এটা কোন গাছ নয়। এর কোন ধর্মীয় পটভূমি নেই। যীশু খৃষ্টের জন্মের আগে প্রাচীন প্যাগান অর্থাৎ ধর্মহীন জাতিগুলোর অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট খৃষ্টানরা 'ক্রিসমাস ডে' পালন করতে গিয়ে এ ধরনের গাছ ব্যবহার করে। উৎসব পালন করে তারা। ঈসা (আঃ)-এর জন্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যখন খৃষ্টানরা এটা পালন শুরু করে তখন ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন নি। আসলে তিনি আগষ্ট বা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা শুধু একটা আচার অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ শওয়ালের রোযা প্রথম দিন থেকেই রাখতে হবে বা শওয়ালের যে কোন দিন রাখলেই চলবে।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটাই সুন্নত যে, শওয়াল মাসের প্রথম ছয়দিনের এ রোযা রাখতে হয়। হুযূর আরও বলেন যে, যখন শওয়ালের রোযা ৩০টি রোযার সাথে একত্র করেন তখন ৩৬টি রোযা হয়। এটাও শরীয়তের একটি বিকল্প। মানুষ যেমন তার সম্পদের $^{১}/_{১০}$ (দশ ভাগের এক) ভাগ ওসীয়্যতের চাঁদা হিসেবে দেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে। সুতরাং যখন কেউ ৩৬টি রোযা রাখলো সে যেন বছরের $^{১}/_{১০}$ ভাগ রোযা রাখলো।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ ঈদের নামাযের কেউ যদি এক রাকাআত না পায় তাহলে ইমামের সালাম ফিরানোর পরে সে বাকী নামায পড়বে কি-না।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। তবে আমার মতে পড়তে হবে না। সে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। এর পরে খুতবা। সুতরাং খুতবা শুনবে। হুযূর প্রশ্নকারীকে তার এ বুদ্ধিত্তামপূর্ণ প্রশ্নের জন্যে ধন্যবাদ দেন। হুযূর বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন হাদীস মনে নেই তবে তার বাকী নামায পড়তে হবে না।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ ই'তিকাফ কি? একটি শিশু প্রশ্ন করে।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পবিত্র কুরআনে ই'তিকাফের কথা আছে আর ইহা সুন্নত কর্তৃক সমর্থিত। রমযানের শেষ দশ দিনে লোকেরা মসজিদে ই'তিকাফে বসেন এবং রমযানের বেজোড় রাতেগুলোতে লায়লাতুল কদরের অন্বেষণে বিশেষ নফল নামায

পড়েন। তোমরা কি লায়লাতুল কদরের কথা শুনেছো, হুযূর জিজ্ঞেস করেন। এ বছর অধিকাংশ ই'তিকাফকারীর মতে ২৭ রমযান লায়লাতুল কদর হয়েছে। কখনও ইহা ২১ তারিখ বা ২৯ তারিখ বা অন্য বেজোড় দিনেও হয়ে থাকে। হুযূর বলেন, প্রত্যেক বেজোড় রাতে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯শে রমযানের রাতে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ লায়লাতুল কদরে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। এ রকম বিভিন্নতার কারণ কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ লায়লাতুল কদর কবে এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ লোকের মধ্যে মতভেদ থাকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এক একজন এক এক দিনের কথা বলে থাকেন। এবার আমি অনেক ই'তিকাফকারীকে জিজ্ঞেস করেছি। অধিকাংশই ২৭ তারিখের কথা বলেছেন। কেউ ২৫ তারিখও বলেছেন কেউ ২৯ তারিখও বলেছেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, রসূলে করীম (সঃ)-ও কোন নির্দিষ্ট রাতের কথা বলেন নি। এর পেছনে হেকমত হলো মানুষ যেন কোন রাতকে নির্দিষ্ট করে বসে না যায়। মানুষ যেন প্রত্যেক বেজোড় রাত্রে চেষ্টা করে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ আমেরিকা থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন। একজন মূসী মর্গেজের (বন্ধকের) মাধ্যমে যদি বাড়ী কিনেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে তিনি সে বাড়ীর হিস্যায়ে জায়দাদ প্রদান করেন। সেই মুসী যদি মর্গেজ প্রদানের জন্যে অতিরিক্ত সময় কাজ করেন তাহলে কি অতিরিক্ত আয়ের ওপরেও তার হিস্যায়ে আমদ দিতে হবে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মর্গেজের টাকা পরিশোধ হলে পরে তিনি এ বাড়ীর হিস্যায় জায়দাদ দিবেন, এর আগে নয়। যদি কোন মুসী ওভার টাইম কাজ করেন তাহলে তিনি তার ঐ আয়ের $^{১}/_{১০}$ ভাগ হিস্যায়ে আমদ হিসেবে চাঁদা দিবেন।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ আপনি একবার বক্তৃতায় আমাদের বলেছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একবার কাশ্‌ফে দেখেছিলেন যে, তিনি এক কবরের কাছে দোয়া করছিলেন যেখানে অন্য একটা লোকও বসেছিলেন। মসীহে মাওউদ (আঃ) অনেক রকম দোয়া করছিলেন এবং কবরের কাছে বসা ব্যক্তি 'আমীন' বলেছিলেন। যখন মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ৯৫ বছর দীর্ঘ জীবন দাও তো সেই ব্যক্তি মন খুলে 'আমীন' বললো না। এ কাশ্‌ফ থেকেই হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি নিজে ৯৫ বছর বাঁচবেন না। তবে এ কাশ্‌ফের ভিত্তিতে মনে করেন যে, তাঁর কোন খলীফা ৯৫ বছর বাঁচতে পারেন। এ বিষয়ে আরও একটু বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ রকমই দেখেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এ ধরনের মনে করতেন যে, কোন খলীফা ৯৫ বছর বয়স পাবেন। কিন্তু এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ চট্টগ্রাম থেকে মনসুর আহমদের প্রশ্নঃ জিন্ন ও ইনসান দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জাতি এ ব্যাপারে কুরআন করীমে কোন পরিষ্কার আয়াত আছে কিনা।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই। কুরআন করীমে পরিষ্কার বলা আছে যে, জিন্নকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এবং মানব সৃষ্টির অনেক পূর্বেই জিন্নকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন করীম যে সত্য গ্রন্থ তার অসাধারণ একটি প্রমাণ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পূর্বে রসূলে করীম (সঃ) কখনও ভাবতেও পারতেন না যে, কতক আগুনের ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে জিন্ন। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। হুযূর বলেন, বর্তমান বিজ্ঞানীদের কথামত জানা যায় এক ধরনের 'পাইরো ব্যাকটেরিয়া' আছে যা আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে তৈরী হয়, তারা জিন্ন। মহানবী (সঃ)-এর একটি হাদীস আছে, তাতে বলা হয়েছে যে, হাড় দ্বারা শৌচকর্ম কোরনা কেননা এগুলো জিন্নের খাদ্য। এছাড়াও জিন্নের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক এমন পুণ্যবান ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরাও জিন্নের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের এ ধরনের একটি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এক দিন তিনি বাড়ীতে একা ছিলেন। বাতি নিভিয়ে শুয়েছেন। দরজাও বন্ধ ছিলো। অন্ধকারে তিনি টের পেলেন কে যেন তার পায়ের ওপরে খুবই চাপ প্রয়োগ করছে। তিনি বলেন, তুমি যে-ই হও না কেন যদি আল্লাহ্ থেকে প্রেরিত হয়ে থাক তাহলে যা খুশী করো আর যদি তা না হও তাহলে এখান থেকে সরে পড়ো। তার একথা বলার সাথে তিনি আর কোন চাপের টের না পেয়ে উঠে বাতি জ্বালালেন কিন্তু কোন সত্তার অস্তিত্বের টের পান নি। তিনি বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে যান। এতে বুঝা যায় যে, রসূলে করীম (সঃ) বা বিজ্ঞানীরা যে জিন্নের কথা বলেছেন, তাছাড়াও আরও এক প্রকার জিন্ন রয়েছে যা বুযূর্গ ব্যক্তিরা দেখেছেন। আমার জীবনেও এ ধরনের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ রমযানে মেয়েরা কেন মেহেদী লাগায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রমযান মাসে খাওয়া পান করাতে কেবল বিধি-নিষেধ, কোন কিছু লাগাতে নিষেধ নেই।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ অনেকে ইশার নামাযের পরে তিন রাকাআত বিতরের নামায পড়ে এবং তাহজ্জুদের সময়েও তিন রাকাআত বিতর পড়েন। এতে জোড় হয়ে যায়। আবার কেউ বলেন, তাহজ্জুদের সময়ে আগে এক রাকাআত পড়ে নিতে। এ ব্যাপারে হুযূর আমাদেরকে সঠিক নিয়ম কি তা বলুন যাতে আমরা জানতে পারি।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যারা তাহাজ্জুদ পড়তে চায় তাদের বিতর নামায পরে পড়া উচিত। যারা নিশ্চিত নয় যে, তাহাজ্জুদে উঠতে পারবে কিনা তারা ইশার নামাযের পরে ~~তাহাজ্জুদ~~ পড়ে নিবে। ~~তাহাজ্জুদ~~ একবারই পড়তে হবে।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ হুযূর, আপনি এখন জিন্ন সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা আছে বলে বলেছেন। আমরা এ বিষয়ে জানতে চাই।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই জিন্ন সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। এটা বলা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে আমি এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলবো।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ ২৭শে রমযান কেন মেহেদী লাগান হয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটি একটি ভুল প্রথা। এ তারিখে বা অন্য তারিখে মেহেদী লাগাতে হবে এমন কোন রেওয়ায়াত নেই। এটা ভুল প্রথা মানুষের মধ্যে চলে এসেছে।

সংকলন ও অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবাগণের জীবন-চরিত

রসূল (সঃ)-এর খাদেম হযরত জা'ফর (রাঃ) বিন আবী তালীব

মুল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ

(১৬তম কিস্তি)

বনী হাশিম পরিবারের প্রদীপ হযরত জা'ফর (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই। হযরত আলী (রাঃ)-এর সহোদর ভাই ও বয়সে তাঁর চেয়ে ১০ বছরের বড়। কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তরবিয়তের কল্যাণ ও স্বয়ং তাঁর (রাঃ) স্বভাবের গুণে হযরত আলীর প্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিলো।

হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর ইসলামে প্রবেশ করার উপলক্ষ্য এভাবে সৃষ্টি হলো যে, একদিন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। হযরত আলীও তাঁর সাথে ইবাদতে শরীক ছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালিব তার পুত্র জাফরের সাথে আসলেন আর তার পুত্র আলী (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে ইবাদতে নিয়োজিত দেখলেন এবং জাফরকে বল্লেন, তুমিও তোমার ভাইদের সাথে ইবাদতে অংশ নিয়ে নাও। হযরত আলী রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ডানে ছিলেন। জাফর বামে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন আর এভাবেই দু'ভাইই ইসলামের প্রাথমিক দুর্বলতার যুগে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হলেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাত এতে শক্তিশালী হলো এবং তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। আর আল্লাহ্তাআলার থেকে জ্ঞান লাভ করে হযরত জা'ফর (রাঃ)-কে এ সুসংবাদ শুনান যে, যেভাবে তুমি আজ তোমার এ ভাইয়ের হাত ও বাহু শক্তিশালী করলে আল্লাহ্তাআলা এর প্রতিদান হিসেবে তোমাকে বেহেশ্তে আধ্যাত্মিকভাবে উড়বার জন্যে দু'টি পাখা দিবেন। তখন থেকে হযরত জা'ফর (রাঃ) 'পাখী' ও 'দু' পাখার অধিকারী' বলে উপাধি লাভ করলেন। (আল্ আকমাল ফী আসমাইর রিজাল, মিশকাত সহ পৃষ্ঠা ১৫৮৯, প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খতীব বাগদাদী, মুদ্রাকর- নূর মুহাম্মদ, আসহুল ছাপাখানা, করাচী)। অর্থাৎ উভয় পাখা দ্বারা উড়ন্ত আধ্যাত্মিক পাখী। হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর জন্যে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ সুসংবাদে আসলে এ আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যেতো যা ভবিষ্যতে শাহাদতের উচ্চ মর্যাদা তাঁর লাভ করার মধ্যে নিহিত ছিলো। এর উল্লেখ করতে গিয়ে অন্য এক উপলক্ষ্যে তিনি (সঃ) বলেন, আমি জা'ফরকে বেহেশতে ফিরিশ্তাদের সাথে উড়তে নিমগ্ন দেখেছি (তিরমিযী, আবওয়াবুল মনাক্বিব)।

হযরত জা'ফর (রাঃ) নিজের কিছু কিছু অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একক অধিকারী ছিলেন। সুতরাং একবার আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খুবই আদরের হযরত যায়েদ (রাঃ)-হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত জা'ফর (রাঃ) হুযূর (সঃ)-এর চূড়ান্ত করুণা ও দয়ার বদৌলতে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁরা তাঁদেরকে হুযূর (সঃ)-এর ভালবাসার যোগ্য ও অধিক প্রিয় বলে জানতেন)-এর মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, হুযূর (সঃ) কাকে সবচে' বেশী ভালবাসেন? হুযূর (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি অতি আদরের সাথে সব প্রিয়দের সাথেই স্নেহের ব্যবহার করে বল্লেন, সবাইই তাঁর (সঃ) ভালবাসার পাত্র। কিন্তু হযরত জা'ফরের সাথে যা বল্লেন, তা শুনে পক্ষপাতিত্ব শূন্যভাবে হযরত জা'ফরের ওপরে ভালবাসার উদ্রেক করে। তিনি (সঃ) বলেন, 'হে জা'ফর! তুমি তো স্বভাব-চরিত্রে ও চেহারা আকৃতিতে আমার সবচে' সাদৃশ্য ও নিকটবর্তী' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪, মিশরী ছাপা)।

হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর জন্যে রসূল (সঃ)-এর এ উক্তি নিঃসন্দেহে ধর্মীয় ও পার্থিব সফলতার সার্টিফিকেট হিসেবে কম নয়।

হযরত জা'ফর প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মুসলমানদের জন্যে মক্কায় পরিবেশ অনুকুলে ছিলো না। তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের লক্ষস্থল বানানো হতো। হযরত জা'ফর ও অন্যান্য মুসলমান মুহাজিরদের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সিদ্ধান্ত করলেন। হিজরতের সফরে তাঁর মহান নেতৃত্বপূর্ণ যোগ্যতার বিকাশ ঘটলো আর তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ্র দরবারে ইসলামী দলের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব খুব ভালভাবে পালন করেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মি সালমাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আমরা আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করি এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর আশ্রয় লাভ করি তখন তা খুবই কল্যাণজনক আশ্রয় বলে প্রমাণিত হলো। আমাদের পুরোপুরি ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ হয়েছিলো। আমরা বিনা বাধায় ইবাদত করতে ছিলাম। কোন প্রকার অপসন্দনীয় কথা বা দৈহিক নির্যাতনের প্রশ্নই ছিলো না। যখন কুরায়শের এ অবস্থা সম্বন্ধে জানা হলো তখন তারা ২ জন নির্ভরশীল কুরায়েশ সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন রবীয়াহ্ ও আমর ইবনুল আসকে দূত বানিয়ে মক্কার ভাল ভাল জিনিসের উপঢৌকন সহ আবিসিনিয়ায় পাঠায়।

ঐযুগে আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা মক্কা থেকে চামড়া আমদানী করতো। সুতরাং মক্কার লোকেরা চামড়ার তৈরী কয়েকটি ভাল ভাল দ্রব্য সংগ্রহ করে আবিসিনিয়ার সকল সর্দারের ও জেনারেলের নিকট উপঢৌকন হিসেবে পাঠায়। আর তাদের দূতদেরকে নির্দেশ দেয় যে, নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্বে প্রত্যেক বড় সর্দার ও জেনারেলকে এ উপঢৌকন উপস্থাপন করে তাদের যেন বলা হয় যে, আমাদের কয়েকজন অবুঝ যুবক নিজেদের ধর্ম ছেড়ে এক নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে আর আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করে নি। কেবল একটি নতুন ধর্ম। যা আমরা জানি না আপনারাও জানেন না। এসব লোক আপনাদের দেশে এসে আশ্রয় লাভ করেছে। আর আমরা যারা আমাদের জাতির যোগ্য ও অভিজ্ঞ সর্দার, আবিসিনিয়ার বাদশাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে ফেরৎ নিয়ে যাবার জন্যে আবেদন করতে যাচ্ছি। এজন্যে যখন বাদশাহ্ আপনাদের সাথে পরামর্শ করবে তখন আপনারাও তাঁর সন্নিকটে এ আবেদন করবেন, যেন তিনি তাদের বক্তব্য না শুনে তাদেরকে আমাদের নিকট সোপর্দ করে দেয়। কেননা আমরা তাদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে ভাল জানি। এসব জেনারেল মতৈক্যে পৌছে এসব দূতকে এ কথাই বলেন, আমরা একথাই বলবো। পরে তারা নাজ্জাশীকে উপঢৌকন উপস্থাপন করে এবং তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জানিয়ে ইহা বলে যে, ইহা মনে করবেন না যে, যুবকরা আমাদের প্রিয় ও নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আপনি তাদেরকে আমাদের নিকট সোপর্দ করুন যেন তাদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি দিতে পারি আর এসব দূতদের সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ইহাই ছিলো যে, মুসলমানদের কথা শুনা ছাড়াই যেন এ সিদ্ধান্ত করিয়ে নেয়া যায়। বাদশাহ্ যখন তাঁর জেনারেলদের সাথে পরামর্শ করলেন তখন তারাও একথা বল্লো যে, মক্কাবাসীদের এ দূত সত্য কথা বলছে। এরা প্রকৃতই বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক আর এসব যুবকদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত। অতএব তাদেরকে তাদের দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া উচিত। ন্যায় বিচারক বাদশাহ্ নাজ্জাশী এতে খুবই ক্রোধান্বিত হলেন আর বলতে

লাগলেন, খোদার কসম! অবশ্যই অবশ্যই এ রকম হবে না। যেসব লোক আমার দেশে এসে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থী হয়েছে আর বিশেষভাবে আমার আশ্রয় লাভ করার জন্যে এসেছে আমি তাদের কথা না শুনে কীভাবে তাদেরকে ওদের হাতে সোপর্দ করে দিই। সুতরাং মুসলমানদেরকে ডাকা হলো। মুসলমানরা খুবই ভীত ও অস্থিরতার মধ্যে ছিলো, না জানি তাদের সাথে কী ব্যবহার করা হয়! কিন্তু খোদাতা'আলার ওপরে পরিপূর্ণ ভরসা রেখে বাদশাহ্ দরবারে উপস্থিত হলেন। নাজ্জাশীর দরবারের পাদ্রী তার ধর্মীয় গ্রন্থসহ উপস্থিত ছিলেন। নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জাতির ধর্মও পরিত্যাগ করেছো আর আগের উম্মতের কোন ধর্ম অবলম্বন করেছো না বা আমাদের ধর্মও না। এ উপলক্ষ্যে বাদশাহ্র সাথে কথোপকথনের সময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধির দায়িত্ব ভালভাবে পালন করেন হযরত জা'ফর বিন আবি তালিব। তিনি তখন নেহায়েৎ দলিল-ভিত্তিক উত্তম ও সুন্দর বক্তব্য পেশ করেন এবং বলেন, হে বাদশাহ্! আমরা ছিলাম একটি মুর্খ জাতি। মূর্তিপূজা করতাম ও মৃত (জীব-জন্তু) খেতাম। ব্যভিচার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে অসদাচরণ আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিলো। আমাদের মধ্যে শক্তিশালীরা দুর্বলদের দাবিয়ে রাখতো। এ অবস্থায় আল্লাহ্তাআলা আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের প্রতি একজন রসূল আবির্ভূত করেছেন, যাঁর পারিবারিক মর্যাদা ও সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা আর পবিত্রতা সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ অবহিত। তিনি আমাদেরকে খোদার একত্ববাদ ও ইবাদর্তের দিকে আহ্বান করেছেন আর এ শিক্ষা দিয়েছেন যেন তাঁর সাথে আমরা কাউকে অংশীদার মনে না করি আর পাথর ও মূর্তিকে পূজা না করি। তিনি আমাদেরকে সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ও রক্তা-রক্তি থেকে বাঁচার শিক্ষা দিয়েছেন। নির্লজ্জতা, মিথ্যা, এতীমদের ধর্ম-সম্পদ গ্রাস করা, পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ দেয়াকে নিষেধ করেছেন এবং আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা এক-অদ্বিতীয় শরীকবিহীন খোদার ইবাদত করি আর আমাদেরকে নামায, রোযা ও যাকাতের শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে হযরত জা'ফর নাজ্জাশীর সামনে ইসলামী শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার খুবই উত্তম ও সুন্দর রঙ্গে উপস্থাপন করেন আর বলেন, আমরা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তাঁর সত্যায়ন করছি। তাঁর শিক্ষা মান্য করেছি এবং গ্রহণ করেছি। আমরা এক-অদ্বিতীয় শরীকবিহীন খোদার উপাসনা করি আর যেসব কাজ থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা মেনে চলি আর যা তিনি আমাদের জন্যে বৈধ করেছেন সেগুলোকে বৈধ মনে করি। বাস, আমাদের অপরাধ এতটাই। এর ভিত্তিতে আমাদের জাতি আমাদের ওপরে সীমালঙ্ঘন করেছে ও আমাদের কঠিন নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টে ফেলে আমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে যেন আমরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনার পরিবর্তে মূর্তিগুলোর পূজা করি। এবং আগের মত নোংরা ও অপবিত্র বস্তুকে বৈধ বলে মনে করি। যখন এদের যুলুম ও সীমালঙ্ঘন চরমে পৌছে গেলো তারা আমাদের ধর্ম -কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে বাধা দিলো তখন আমরা নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয়ের জন্যে আসি আর আমরা আপনার ন্যায়-বিচারের কারণে আর কারও নিকট না গিয়ে আপনাকে বেছে নিয়েছি এবং আপনার নিকট আশ্রয় পাওয়ার আশায় চলে এসেছি। হে মহান বাদশাহ্! আমাদের পুরোপুরি আশা যে, আপনার রাজ্যে আমাদের ওপরে কোন অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের সুযোগ দেয়া হবে না। নাজ্জাশী হযরত জা'ফরের এ বক্তব্যে খুবই মুগ্ধ হলেন। আর বল্লেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বাণী নিয়ে এসেছেন এর কিছু কি তোমাদের নিকট মজুদ আছে? হযরত জা'ফর একথার ওপরে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলে তিনি বলেন, আচ্ছা, আমাকে তাথেকে কিছু কালাম পাঠ করে শুনাও। হযরত জা'ফরের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার ওপরে ঈর্ষা হয় যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সময় সুযোগ বুঝে উপযুক্ত সূরা সূরাতু মারইয়াম-এর আয়াত তিলাওয়াত এমন হৃদয়গ্রাহী ও মিষ্টি সুরে করেন যে, খোদাভক্ত নাজ্জাশী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁদতে লাগলেন। এত কাঁদলেন যে, তার দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেলো। আর সারাটা মহফিলে কুরআন শরীফের এ পবিত্র ও সত্য কালামের এমন প্রভাব হলো যে, দরবারের পাদ্রীরাও কাঁদতে লাগলেন এমন কি তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের চোখের পানিতে ভিজে গেলো। নাজ্জাশী এ ঐশী-বাণী শুনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, খোদার কসম! এমন মনে হয় যে, এ বাণী ও মূসা (আঃ)-এর বাণী একই উৎস ও প্রস্রবণ থেকে উৎসরিত হয়েছে। আবার ঐ ন্যায়-বিচারক বাদশাহ্ এভাবে বল্লেন, হে মক্কার দূতেরা! তোমরা ফিরে যাও। খোদার কসম! আমি এসব লোককে অবশ্যই তোমাদের কাছে সোপর্দ করতে পারি না। মক্কার দূতেরা আরও পরামর্শ করলো। আর বল্লো, তারা বাদশাহ্র সামনে তাদের খারাপ ধর্মীয় বিশ্বাস ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে ঐ পুণ্য প্রভাবকে বিনষ্ট করেই ছাড়বে আর তাঁকে বল্লো, এরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে খৃষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী কেবল একজন মানুষ বলেই মানে আর তাঁর দুর্বলতা দেখাবার ও নিন্দার চেষ্টা করে। সুতরাং পরবর্তী দিন তারা বাদশাহ্র সামনে এ বিষয় রাখলো। বাদশাহ্ আবার মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন। মুসলমানদের জন্যে নিঃসন্দেহে এটা খুবই অস্থিরতার বিষয়ে ছিলো। হযরত উম্মি সালমা (রা)-এর বর্ণনা পাওয়া যায় যে, এ নতুন সংকটে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে, এমন সংকটের সম্মুখীন এর পূর্বে হই নি। তখন মুসলমানরা সবই একত্র হয়ে পরামর্শ করলো এবং বল্লো, যদি বাদশাহ্ হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মর্যাদার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তখন আমরা তা-ই বর্ণনা করবো যেভাবে কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং যখন বাদশাহ্ প্রশ্ন করলেন, ঈসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গে তোমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কী? তখন হযরত জা'ফর (রাঃ) বল্লেন, এ সঙ্গে আমাদের নবীর প্রতি এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে যে, ঈসা আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল রূহুল্লাহ্ আর তাঁর বাণী আছে যা তিনি কুমারী মরিয়মকে দিয়েছিলেন। এরপর নাজ্জাশী মাটিতে হাত মারলেন এবং সেখান থেকে একটি মাটির কণা উঠিয়ে বলতে লাগলেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা এ মাটির কণার সমানও এথেকে বেশি নয় যা কিনা তুমি বর্ণনা করেছো। এতে তার সর্দার ও জেনারেল বিড় বিড় করলো ও মনক্ষুণ্ন হলো। কিন্তু নাজ্জাশী পরিপূর্ণ প্রতাপ ও মর্যাদার সাথে এ ন্যায়-বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন এবং বল্লেন, যাও হে মুসলমানরা! আমার দেশে তোমাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হলো। যদি কেউ তোমাদের সাথে অসদাচরণ করে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আমি ইহা কখনও পসন্দ করি না যে, ধন-সম্পদের বদৌলতে আমি তোমাদের কাউকে কষ্ট দিই। আর নাজ্জাশী আদেশ দিলেন, আরব দূতদের উপঢৌকন ফেরৎ দিয়ে দেয়া হোক। তাদের আমার কোন প্রয়োজন নেই। খোদার কসম! যখন আল্লাহ্তাআলা আমাকে এ রাজত্ব দিয়েছেন তখন কোন ঘুষ নেন নি যে, আমি ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ঘুষ নেবো। মোটকথা এভাবে হযরত জা'ফর এক যুগে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে নিজের দেশ, জন্মভূমি ও নিজের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে থেকে দূরে আবিসিনিয়ার ভূমিতে কাটিয়েছিলেন। পরে যখন অবস্থা ঠিকঠাক হয়ে গেলো তখন আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় হিজরত করার সৌভাগ্যও লাভ করেন এবং খয়বরের বিজয়ের উপলক্ষ্যে মুসলমান মুহাজিরগণ আবিসিনিয়ার কাফেলা হযরত জা'ফর-এ নেতৃত্বে ফিরে আসেন তখন হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খয়বরে ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত জা'ফর-এর আগমনে তিনি স্বয়ং এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং ভালবাসার আবেগে তাঁর কপালে চুমু খান এবং বলতে লাগলেন, আজ আমি এত খুশী হয়েছি যে, বলতে পারছি না খয়বরের বিজয়ে অধিক খুশী হয়েছি না জা'ফর-এর সাক্ষাতে বেশি খুশী হয়েছি (তাবক্বাত ইবনে সা'দ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩)। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(১১তম কিস্তি)

সালাতুল হাজাত (বিশেষ সমস্যা নিরসন)-এর নামায ও দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী আওফা বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির আল্লাহ্তাআলার বা কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু প্রয়োজন দেখা দেয় সে উত্তমভাবে ওযূ করে দু'রাকাআত 'সালাতুল হাজত' নামায পড়ে আর হামদ ও সানা (আল্লাহ্র প্রশংসা) ও দুরূদ [রসূল করীম (সঃ)-এর জন্যে আশিস কামনা] পাঠ করার পরে এ দোয়া করবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ،اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ،اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ،وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ ،لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ ،وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম-সুবহানাল্লাহি রব্বিল 'আরশিল 'আযীম-আল্হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন-আসয়ালুকা মূজিবাতি রহমাতিকা- ওয়া 'আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বির্‌রিঁওয়াস্ সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন- লা তাদা'লী যান্বান ইল্লা গফারতাহূ ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফার্‌রাজতাহূ-ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রিযান ইল্লা ক্বযায়তাহা ইয়া আরহামার রহিমীন-তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম সহিষ্ণু ও দয়ালু। আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি মহান আরশের প্রভু-প্রতিপালক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহকে আকর্ষণকারী কথা ও তোমার ক্ষমার খাঁটি উপকরণ লাভের প্রত্যাশী এবং প্রত্যেক পুণ্যকে দান মনে করে আর প্রত্যেক পাপ থেকে নিরাপদে থাকার সৌভাগ্য চাচ্ছি। তুমি আমার সব পাপ এমনভাবে ক্ষমা করে দাও যেন একটিও অবশিষ্ট না থাকে। আমার কোন দুঃখ অবশিষ্ট রেখো না বরং তুমি স্বয়ং উহা দূর করে দাও আর আমার এমন কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট রেখো না যা কিনা তোমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয় বরং তুমি স্বয়ং তা পূরো করে দাও। হে সকল অনুগ্রহকারীদের চেয়ে বড় অনুগ্রহকারী (তুমি অনুগ্রহ করো)।

ইসতিখারার দোয়া

♦ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবা (রাঃ)-কে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পার্থিব কাজের পূর্বে উহা কল্যাণমন্ডিত ও সফলতা লাভের জন্যে উত্তম দোয়ার শিক্ষা দিয়েছেন যাকে **সালাতুল ইসতিখারাহ্** বলে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ،فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ،اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهٖ۔

(ترمذی کتاب الدعوات وابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلوۃ)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়াস্তাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা ওয়া আসয়ালুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম-ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্তা 'আল্লামুল গুয়ূব - আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযালআমরা খয়রুল্লী ফী দীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আক্বিবাতি আমরী ফাআক্বদিরহুলী ওয়া ইয়াস্সিরহুলী সুম্মা বারিক লী ফীহি ওয়া ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফী দীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আক্বিবাতি আমরী ফাসরিফহু 'আন্নী ওয়াসরিফনী 'আনহু ওয়া আক্বদুরলিয়াল খয়রা হায়সু কানা সুম্মা রয্যিনীবিহী (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ইবনে মাজাহ্, কিতাব ইক্বামাতিস্ সলাত)

অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার জ্ঞানের মধ্য থেকে মঙ্গল কামনা করছি, এবং তোমার শক্তি ও মহিমা থেকে শক্তি কামনা করছি। আর তোমার মহা আশিস থেকে আশিস কামনা করছি। কেননা, তুমি শক্তিশালী আর আমি শক্তিশালী নই। এবং তুমি সর্বজ্ঞ আর আমার মোটেই জ্ঞান নেই এবং তুমি অদৃশ্যের সব কিছু অবহিত। হে আল্লাহ্! যদি তুমি জেনে থাকো যে, এ কাজ (এস্থলে অভীপ্সিত কাজের উল্লেখ করতে হবে) আমার জন্যে আমার দীন ও দুনিয়ার জন্যে আর আমার পরিণামের জন্যে কল্যাণজনক হয় তাহলে তুমি ইহাকে আমার জন্যে নির্ধারিত করে দাও, আমার জন্যে সহজসাধ্য করে দাও অতঃপর আমার জন্যে কল্যাণময় করে দাও। এবং যদি তুমি জেনে থাকো যে, এ কাজ আমার দীন ও দুনিয়ার জন্যে এবং আমার শেষ পরিণতির জন্যে অকল্যাণজনক হয় তাহলে একে আমা হতে দূরে রাখো আর আমাকে এ হতে দূরে রাখো এবং যেখানে আমার জন্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে তা নির্ধারিত করে দাও আমার জন্যে। অতঃপর এতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

সালাতুত্তাসবীহ্

♦ হযরত আবূ রাফে' (রাঃ)-এর একটি মাত্র দুর্বল বর্ণনা অনুযায়ী রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে এ নফল নামাযের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন আর এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হে চাচা! আমি কি তোমাকে এমন একটি জিনিস দেবো না যার ফলশ্রুতিতে তোমার সামনের ও পেছনের নতুন পুরাতন পাপ, অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ছোট বড়, গোপন প্রকাশ্য সব পাপ মাফ করে দেয়া যাবে। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পরে যে, রোজ এ নামায পড়ার কি কারও ক্ষমতা আছে? তখন তিনি (সঃ) বলেন, এ নামায সামর্থ্যানুযায়ী প্রত্যেক দিনে, সপ্তাহে, মাসে, বছরে বা জীবনে একবারও পড়তে পারো। এ চার রাকা'আত নফল নামাযের পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক রাকা'আতে সূরাতুল ফাতিহা ও আর কোন সূরা পাঠ করার পরে ১৫ বার **সুবহানাল্লাহি ওয়াল**

হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর বলবে। আবার রকূতে তসবীহ পড়ার পরে, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে তসবীহ ও তাহমদীদের পরে, সিজদাহ্‌র দোয়ার পরে এবং প্রত্যেক রাকা'আতের দ্বিতীয় সিজদাহ্‌র তসবীহ্ পড়ার পরে ১০ বার করে উপরোক্ত দোয়া পড়বে। এভাবে এক রাকা'আতে ৭৫ বার ও ৪ রাকা'আতে ৩০০ বার এ দোয়া পাঠ করবে (তিরমিযী, কিতাবুস্ সলাত)।

নিত্যদিনের বিভিন্ন দোয়া

১। প্রত্যেক কাজ **বিসমিল্লাহ্** দিয়ে শুরু করা হয়। যদি খাবার পূর্বে **বিসমিল্লাহ্** বলতে ভুলে যায় তাহলে শেষে **বিসমিল্লাহি ফী আওওয়ালিহী ওয়া আখিরিহী** (প্রথমেও আল্লাহ্‌র নামে এবং শেষেও)পড়বে (তিরমিযী, কিতাবুল আত্‌আমাহ্)

খাওয়া-দাওয়ার পরে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে গিয়ে **আলহামদুলিল্লাহ্** বলা আবশ্যক (মুসলিম, কিতাবুয্ যিকর)।

২। পথে চলতে বা সভা-সম্মেলনে এবং ঘরে আসতে যেতে **আস্‌সালামু আলায়কুম**-এর দোয়া দেয়া উচিত। যে রাস্তায় হাঁটছে সে বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং যে যান-বাহনে আরোহণ করে আছে সে পথে চলা ব্যক্তিকে সালাম করবে। পূর্ণ সালামের দোয়া কারও ওপরে করলে সালামকারী ব্যক্তির ৩০টি পুণ্য লাভ হবে। পূর্ণ সালামটি এরূপ ঃ

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহূ- অর্থাৎ আপনার ওপরে সালামতি (নিরাপত্তা), আল্লাহ্‌র রহমত (অনুগ্রহ) ও বরকত (কল্যাণ) বর্ষিত হোক।

শ্রোতাকেও জবাবে **ওয়া আলায়কুমুস সালাম** বলতে হবে (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাহ্)।

৩। কেউ ভাল কাজ করলে তাকে **জাযাকাল্লাহু খয়রান** দোয়া দেয়া অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন (তিরমিযী, কিতাবুল বির্)।

৪। মোরগের ডাক শুনার পরে আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর আশিস চাওয়া আবশ্যক। কুকুর ও গাধার ডাক শুনার পরে **আউযুবিল্লাহ্** পড়া আবশ্যক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)।

৫। এক ব্যক্তিকে প্রচন্ড রাগান্বিত দেখে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার এমন একটি কথা জানা আছে যা পড়লে এর রাগ দূর হয়ে যাবে আর তা এই ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাশ্ শায়ত্বানির রজীম-হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয় চাই (আবূ দাউদ, কিতাবুল আমর)।

৬। ভাল স্বপ্ন দেখলে **আল্‌হামদুলিল্লাহ্** বলতে হয় এবং লোকদের শুনালে কোন দোষ নেই। আর খারাপ স্বপ্ন দেখলে **আ'উযুবিল্লাহ্** বলতে হয় এবং এ স্বপ্ন কাউকে বলা উচিত নয় (তিরমিযী, কিতাবুদ্ দো'আ)।

৭। হাঁচি দিলে নিজে **আল্‌হামদুলিল্লাহ্** বলবে। অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। যিনি শুনবেন তিনি **ইয়ারহামুকাল্লাহু** অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার প্রতি করুণা করুন। এর পরে হাঁচিদাতা **ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বা-লাকুম** (আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকে সুপথ প্রদর্শন করুন ও তোমার অবস্থা ভাল করুন) বলে দোয়া দেবে (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)। (চলবে)

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

(সূচীর পাতার পর)

কালামুল ইমাম
খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত সম্বন্ধে

আহমদীয়া খেলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন,

"ইসলামের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে খেলাফত একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম কখনও অগ্রগতি লাভ করবে না যতদিন খেলাফত না থাকবে। চিরকাল খেলাফতের মাধ্যমে ইসলাম অগ্রগতি লাভ করেছে, আগামীতেও এরই মাধ্যমে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবে এবং চিরকাল আল্লাহ্‌তাআলা খলীফাদের নির্বাচিত করেছেন, ভবিষ্যতেও আল্লাহ্‌তাআলাই খলীফা নির্বাচিত করবেন।

অতএব তোমরা খুব স্মরণ রাখ, তোমাদের অগ্রগতি ও উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেদিন তোমরা এই তত্ত্বকে বুঝবে না এবং একে প্রতিষ্ঠিত রাখবে না সে দিন তোমাদের ধ্বংসের এবং সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে বুঝতে থাক এবং একে প্রতিষ্ঠিত রাখ, সমগ্র পৃথিবীও যদি তোমাদিগকে ধ্বংস করতে চায় তবে তারা তা করতে পারবে না। এবং তোমাদের বিপক্ষে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে থাকবে।

বড় বড় কঠিন দিন আসবে, বড় কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু জামাত কোনদিন নষ্ট হবে না। বরং দিন দিন উন্নতি করবে। এমতাবস্থায় শত্রুর হাতে তোমাদের কোন একজনের মৃত্যুবরণ করা এমনই হবে যেমন কথায় বলে, এক দৈত্য মরলে হাজারো দৈত্যের জন্ম হয়ে যায়। তোমাদের একজন যদি মারা যায় তবে তার বদলে তার রক্ত বিন্দু থেকে হাজার হাজার সৃষ্টি হয়ে যাবে" (দরসে কুরআন মাজীদ, প্রকাশিত ১৯২১ইং)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) আরও বলেন,

"আমি একবার স্বপ্নে দেখেছি একজন খেলাফতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে। আমি তাকে বলছি, "যদি তুমি বহু খোঁজ-খবর করে কোন যথার্থ আপত্তিও তুলে ধরো তবুও তোমার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পড়বে এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ্ আমাকে যে পদ-পর্যাদার উপর দাঁড় করিয়েছেন এর জন্য তিনি আত্মাভিমান রাখেন। প্রকৃত বিষয় এই যে, এ পদ-মর্যাদার কারণে আল্লাহ্ এর বিরোধীদের ধ্বংস করেন। দেখ, অতীতেও যারা খলীফাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়েছে তারা কীভাবে অভিশাপের নীচে এসে গেছে। তোমাদের মধ্যেও যদি কেউ খেলাফতের বিরোধতা করে তবে সে মৃত হবে" (দরসে কুরআন মাজীদ, প্রকাশিত ১৯২১ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১০ই জুন, ১৯৮২ইং বৃহস্পতিবার বাদ নামায যোহর মসজিদে মোবারক রাবওয়ায় খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। পরের দিন শুক্রবার জুমুআর খুতবায় বলেন,

"অতএব বয়াত করা একান্ত জরুরী (আবশ্যক) এবং এটি একটি সুন্নত, যে কোন মূল্যেই হোক অবশ্যই একে জীবিত রাখতে হবে। এ জন্য যা আবশ্যক তা এই যে, বয়াতের বাক্যগুলো উচ্চারণের সময় যখন মন-প্রাণ বিশেষভাবে বেদনা বোধ করে, তখন একটি নতুন জীবন লাভ হয়, একটি নতুন রূহ প্রাপ্তি ঘটে আর একটি নব-জীবন লাভ হয়। এই সময়টার মূল্যাবোধকে অনুধাবন করুন এবং একে হাতছাড়া হতে দিবেন না" (আল্ ফযল, ২২শে জুন, ১৯৮২ইং)।

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(নবম কিস্তি)

সূরাতুল বাকারাহ্-২

ফা ইয়াতা'আল্লামুনা মিনহুমা মাইউফাররিকূনা
অতএব তারা শিখতো তাদের উভয়ের কাছ থেকে যা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতো

বিহী বায়নাল মারই ওয়া যাওজিহী ওয়ামা হুম
তা দ্বারা মাঝে পুরুষের এবং তার স্ত্রী এবং তারা ছিলো না

বিযারীনাবিহী মিন আহাদিন ইল্লা বিইযনিল্লাহ
এর দ্বারা ক্ষতি সাধনকারী এর মাধ্যমে কারও আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া

ওয়া ইয়াতা'আল্লামুনা মা ইয়াযুরুহুম ওয়ালা ইয়ানফাউহুম
এবং তারা শিখতো যা ক্ষতি করবে তাদের এবং তাদের উপকার করবে না

ওয়া লাক্বাদ 'আলিমূ লামানিশ্‌তারা মালাহূ
আর অবশ্যই তারা জেনে নিয়েছে যে কেউ তা অবলম্বন করবে তার জন্যে নেই

ফীল আখিয়াতি খালাক্বিন ওয়া লা বিসা
আখেরাতে কোন অংশ এবং কতই না মন্দ

মাশারাও বিহী আনফুসাহুম লাও কানূ ইয়া'লামূন
যার বিনিময়ে বিক্রয় করেছে নিজেদের আত্মাকে হায়! যদি তারা জানতো

১০৪। ওয়ালাও আন্নাহুম আমানূ ওয়াত্তাকাও
এবং যদি তারা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো

লামাসূবাতান মিন'ইনদিল্লাহি খয়ের লাওকানূ ইয়া'লামূন
অবশ্যই বিনিময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে উত্তম হায়! যদি তারা জানতো

১০৫। ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ লা তাকূলূ রা'ইনা
হে যারা ঈমান এনেছো তোমরা রা'ইনা বলো না

ওয়া কূলূ উনযুরনা ওয়াসমাউ
আর তোমরা বলো উনযুরনা (তুমি আমাদেরকে দেখো) এবং শোন তোমরা

ওয়া লিল কাফিরীনা 'আযাবুন 'আলীম
এবং কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

১০৬। মা ইয়াওয়াদ্দু আল্লাযীনা কাফারা মিন আহলিল কিতাব
চায় না অস্বীকার করে যারা তারা কিতাবীগণের মধ্য থেকে

ওয়ালা আল্ মুশরিকীন আঁইউনাযযালা আলায়কুম
এবং না অংশীবাদীরা যেন অবতীর্ণ হয় তোমাদের প্রতি

মিন খায়রিন মিররব্বিকুম ওয়াল্লাহ্
কোন উত্তম / মঙ্গল তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আর আল্লাহ্
পক্ষ থেকে

ইয়াখতাস্সু বিরহমাতিহী মাঁইশাউ ওয়াল্লাহু
সে/তিনি নির্দিষ্ট করে/করেন তাঁর অনুগ্রহকে যার জন্যে তিনি চান এবং আল্লাহ্

যূল ফযলিল 'আযীম ১০৭। মা নানসাখ
মহান আশিসের অধিকারী যা আমরা রহিত করি

মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি
আয়াত থেকে অথবা আমরা ইহাকে ভুলিয়ে দেই আমরা নিয়ে আসি

বিখায়রিন মিনহা আও মিসলিহা আলামতা'লাম
উত্তম তাথেকে অথবা তার অনুরূপ তুমি কি জান না

আন্নাল্লাহা 'আলা কুল্লিশায়ইন ক্বদীর
যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপরে (যা তিনি চান) সর্বশক্তিমান

১০৮। আলাম তা'লাম আনাল্লাহা লাহূ মূলক
তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তাঁর রয়েছে আধিপত্য

আস্‌সামাওয়াত ওয়াল আরয্ ওয়ামা লাকুম
আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী এবং নেই তোমাদের জন্যে

মিন দূনিআল্লাহ্ মিঁওয়া লিইন ওয়ালা নাসীর
ছাড়া আল্লাহ্ কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী

১০৯। আম তুরীদূনা আন তাসয়ালূ রসূলাকুম
তোমরা কি চাও যে, তোমরা প্রশ্ন করো তোমাদের রসূলকে

কামা সুয়িলা মূসা মিন ক্বলু
যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে মূসা (আঃ) (এর) আগে

ওয়ামাঁ ইয়্যা তাবাদ্দালি আল্ কুফরা বিল ঈমানি
এবং যে বদলে নেয় কুফরী ঈমানের পরিবর্তে

ফাক্বদ যাল্লা সাওয়ায়াসসাবীল
অতএব নিশ্চয় সে ভ্রষ্ট হয়েছে সঠিক পথ থেকে

ওয়াদ্দা কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব
চায় অনেকেই আহলে কিতাব থেকে

লাও ইয়ারুদ্দুনাকুম মিম্বা'দি ঈমানিকুম
হায়! যদি তোমাদেরকে তারা পরে তোমাদের ঈমান নেয়ার
ফিরিয়ে নিতে পারতো

কুফ্ফারান হাসাদান মিন 'ইনদি আনফুসিহিম
কাফির বিদ্বেষের কারণে তাদের নিজেদের ভিতর হতে

মিম্বা'দি মা তাবাইয়্যানা লাহুমুলহাক্ক
পরে যা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাদের কাছে সত্য

ফা'ফূ ওয়াসফাহূ হাত্তা ইয়া'তিয়া
অতএব তোমরা মার্জনা করো এবং তোমরা উপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না তিনি নিয়ে আসেন

আল্লাহু বিআমরিহী, ইন্নাল্লাহা 'আলা কুল্লিশায়ইন
আল্লাহ্ তাঁর আদেশে নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপরে

ক্বদীর ১১১। ওয়া আকীমুস্ সলাত ওয়াআতুয্যাকাতা
সর্বশক্তিমান। এবং তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং তোমরা যাকাত দাও

ওয়ামাতুকাদ্দিমু লি আনফুসিকুম মিন খায়রিন
এবং যা তোমরা সামনে পাঠাও তোমাদের নিজেদের জন্যে কোন পুণ্য

তাযিদুহু ইন্দাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বিমা
তোমরা তা পাবে আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয় আল্লাহ্ তা যা

তা'মালূনা বাসীর ১১২। ওয়া ক্বালূ
তোমরা করে থাকো পুরোপুরি দেখেন আর তারা বলে

লাঁইয়াদখুলা আলজান্নাহ ইল্লা মান কানা
কখনও সে প্রবেশ করবে না বেহেশ্‌তে ছাড়া যে হয়েছে

হুদান আও নাসারা তিলকা আমানিয়্যুহুম
ইহুদী অথবা খৃষ্টান এটা তাদের বৃথা আশা

কুল হাতূ বুরহানাকুম ইনকুনতুম
তুমি বলে দাও তোমরা নিয়ে এস তোমাদের দলীল যদি তোমরা হও

সদিক্বীন ১১৩। বালা মান আসলামা
সত্যবাদী কেন নয় (বেহেশতে যাবে) যে আত্মসমর্পণ করেছে

ওয়াজহাহূ লিল্লাহি ওয়া হুয়া মুহসিনুন ফালাহূ
তার মনোনিবেশ আল্লাহ্‌র প্রতি এবং সে সৎকর্মপরায়ণ অতএব তার জন্যে রয়েছে

আজরুহূ ইনদা রব্বিহি ওয়ালা খওফুন
তার প্রতিদান তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এবং নেই কোন ভয়

আলায়হিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্‌যানূন ১১৪। ওয়া ক্বালাতি
তাদের আর তারা মর্মাহতও হবে না আর তারা বলে

আল্ ইয়াহূদ লাইসাতি আন্ নাসারা 'আলাশায়ইন
ইহুদীরা নয় খৃষ্টানরা কিছুর উপরে

ওয়া ক্বালাতিন্নাসারা লায়সাতি আল্ ইয়াহূদু
এবং খৃষ্টানরা বলে নয় ইহুদীরা

'আলা শায়ইন ওয়া হুম ইয়াতলূনা আল্ কিতাব
কিছুর উপরে অথচ তারা তিলাওয়াত করে বা পড়ে (একই) গ্রন্থ

কাযালিকা ক্বালা আল্লাযীনা লা ইয়া'লমুনা মিসলা ক্বওলিহিম
এভাবেই তারা বলেছিলো যারা জ্ঞান রাখতো না তাদের কথার মত

ফাল্লাহু ইয়াহকুমু বায়নাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি
সুতরাং আল্লাহ্ মীমাংসা করবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিনে

ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূনা
এতে তারা ছিলো যাতে তারা মতভেদ করতো। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

কাশ্মীর উপত্যকার প্রথম দায়ী ইল্লাল্লাহ্ ঃ
হযরত মাওলানা মাহবুব আলম
মূল ঃ জনাব আব্দুল ওহাব আহমদ
(২য় ও শেষ কিস্তি)

ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ও নিদর্শন

হযরত মৌলভী সাহেব তীব্র বিরোধিতা ও গালাগালির বদলে দোয়া আর দুঃখ পেয়ে সকলকে আরাম দেন। খোদাতাআলা নিজের সমর্থন ও সাহায্যের অসংখ্য নিদর্শনের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন। হযরত মাওলানা সাহেবের জীবনেও অগণিত ঈমান উদ্দীপক ঘটনা রয়েছে যা আল্লাহ্তাআলার সাহায্যের নিদর্শন।

১। আমি আহমদী হলাম ঃ

মরহুম হাজী আমীর আলম, যিনি আজাদ কাশ্মীরের সাবেক রিজিওনাল আমীর ছিলেন, আমাকে বলেন (লেখক) ঃ "এক ভ্রমণকালে হযরত মাওলানা মাহবুব আলম কোটলী মহল্লার বালীয়ার মসজিদে নামায পড়েন। আমি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিই। মসজিদ নাপাক হয়ে গেছে বলে মসজিদ ধুয়ে ফেলি এবং খুব গালাগালি করি। তিনি মুচকি হেসে বলেন, আমির আলম আপনি আহমদী হয়ে গেছেন। এতে আমি আরো রেগে গিয়ে মুখে যা আসে তা বলে গালাগালি করি। সম্ভবতঃ কোন শুভ সময় ছিল। তাঁর মুখের কথা আসমানে গৃহীত হয়। আমার আহমদীয়তের প্রতি বিরোধিতার আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়। আমি আহমদী হয়ে যাই।" আলী সাহেব মরহুম ও তাঁর ভাইদেরও আহমদীয়ত গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়। কিন্তু তাঁর বংশের অন্য সকলে আহমদীয়তের বিরোধী থাকে।

২। বোবা কথা বলে ঃ

গোলাই আহমদীয়া জামাতের সাবেক সদর মরহুম মৌলভী ইমাম উদ্দিন বলেন, "আমি ছোটবেলা (আনুমানিক ৬/৭ বছর বয়স) কথা বলতে পারতাম না। এক রকমের বোবা ছিলাম। আমার আব্বা আমাকে হযরত মৌলভী সাহেবের নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, আমার ছেলে বোবা হয়ে গেছে। কথা বলতে পারে না। মৌলভী সাহেব বলেন, "তোমার মুখ খোল", আমি মুখ খুললে তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে তার মুখের কিছু লালা আমার মুখে লাগিয়ে দেন এবং বলেন, "এখন এ ছেলে খুব বলবে," এরূপই হ'ল। এ সময় থেকে ঐশ্বরিক নিদর্শনের মত আমার রোগ সেরে যায়। এরপর আমি বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছি। সব রকমের কথা-বার্তায় পারদর্শী হয়েছি।

৩। মাথা দুখন্ড হলো ঃ

এক স্থানে ঝরণার ধারে গাছের ছায়ায় মঞ্চ তৈরী করে মাওলানা সাহেব ইবাদত ও দায়ী ইলাল্লাহ্র কাজ শুরু করেন। এক ব্যক্তি রেগে কুড়াল নিয়ে গাছের ডাল কাটতে ওঠে, যাতে গাছের ছায়া না পেয়ে মাওলানা সাহেব ওখান থেকে চলে যান। মাওলানা সাহেব খুব তেজ দৃপ্ততার সাথে বলেন, "তুমি গাছের ডাল কি কাটবে। খোদার ক্রোধ ও প্রতাপ তোমাকে কেটে ফেলবে।" তাঁর কথা শুনে সে ব্যক্তি কাঁপতে কাঁপতে নীচে পড়ে যায়। ওপর থেকে কুড়ালটি তার মাথাতে পড়ায় সে যখম হয়। এরূপে সে নিজের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আহমদয়ীতের সত্যতার নিদর্শন রেখে যায়।

৪। আত্মীয় স্বজনসহ ধ্বংস ঃ

গাওলা এলাকায় বিনসান গ্রামে রাজু বেলীয়া নামে এক ব্যক্তি ছিল। ধন দৌলতের প্রাচুর্য, মর্যাদা ও শান শওকতের জন্য এ এলাকার রাজা বলা হ'ত। তার মহলের কিছু দূরে গাছের ছায়ায় এক ঝরণা ছিল। মাওলানা সাহেব তাঁর সাথীদের (যারা আহমদী হয়েছিল) সাথে সেখানে ইবাদত করতেন। রাজু বানীয়া, যে হযরত মৌলভী সাহেবকে খুব কষ্ট দিত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) মর্যাদার অসম্মানী করতো, একদিন প্রকাশ্যে সামনে আসে, আর ধমক দিয়ে বলে, "তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। তোমাদের ইবাদত আমাদের আরামে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। অন্যথায় এরূপ বিপদে ফেলবো যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে"। হযরত মৌলভী সাহেব এ শুনে বলেন, "রাজু তোমার মধ্যে এ শক্তি আছে"? সে গর্জন করে বলে ওঠে, "আমার এ শক্তি আছে যে, এ গাছের শিকড়কে আসমানের দিকে আর শাখা জমীনে পুঁতে দিতে পারি।" তিনি উত্তরে বলেন, "যাও তোমার শিকড় উপড়ে গেছে। কোন শক্তি তোমাকে ধ্বংস থকে বাঁচাতে পারবে না। আর এ গাছ চির হরিৎ ও সতেজ থাকবে"।

তিনি যেরূপ বলেন সেরূপ হয়। রাজু, তার দুই স্ত্রী, আর সব সন্তানরা কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এরূপে সমস্ত বংশ ধ্বংস হয়। একটি সন্তানও তার নাম নেয়ার মত ছিল না। আর ঐ গাছ যার একটি শিকড় এক সময় শুকনা ছিল, যেটি রাজু বেনীয়া উপড়ে ফেলার অহঙ্কার করে, একশ' বছর পর তা সবুজ ও সতেজ আছে। আর শুকিয়ে যাওয়া গাছটিতে নতুন শাখা বার হয়েছে এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজু বানীয়া সবংশে ধ্বংস হয়ে এলাকাতে আহমদীয়তের সত্যতার নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করে।

৫। শত্রু অন্তর্ধান হয়ে গেল ঃ

বরমোচ মৌজার আল্লাহ্ দিত্তার (যার একভাই মঙ্গুদিত্তা আহমদী হয়) সাথে হযরত মাওলানা মাহবুব আলমের সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর সাক্ষাতে প্রভাবিত হয়ে বলেন, "আমি আপনাকে যেতে দেব না। আমি রাস্তায় শুয়ে পড়ছি। আপনি যদি যেতে চান তবে আমার ওপর দিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় নয়। আমার মীরচালি মৌজার জমি ও ঘর-বাড়ী নিয়ে নিন। আর ওখানে থেকে আমার বাচ্চাদের কুরআন করীম শেখান।" হযরত মৌলভী সাহেব তার কথায় রাজী হয়ে জমি ও ঘর বাড়ীর দাম মিটিয়ে দিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন ও তার ছেলে-পেলেদের পড়ানো শুরু করেন। মাত্র কয়েক মাস পরে চৌধুরী আলা দিত্তা বলে যে, আমার এ জমি ও ঘরবাড়ী ক্ষত্রীয়দের ধারে দিতে হবে। এজন্য আপনাকে ৬ মাসের নোটিশ দেয়া হলো। এর মধ্যে অন্য কোন স্থানে চলে যান।

হযরত মাওলানা মাহবুব আলম সাহেবের... একথাতে এজন্য খুব দুঃখ হয় যে, যে কাজের জন্য আমাকে রাখা হয়েছিল এখন তা পূরণ হয় নি। জমি-জমা ও বাড়ীর দামতো আমি শোধ করেছি। এসব তো এখন তাদের নয়। তবু আমি এ সবের পরওয়া করি না, যদি আসল উদ্দেশ্য পুরো হয় অর্থাৎ ছেলে-পেলেরা যদি কুরআন করীম শিখে যায়। তিনি তাকে বোঝান যে, আমার জমি-জমার দরকার নেই আর এর মূল্যই বা কি আছে। জমি-জমা তোমাকে দিয়ে যাব। আর যে দাম আমি দিয়েছি তা-ও নেব না। কিন্তু তাড়াতাড়ি করো না। নিজের ছেলে-পেলেদের কুরআনের আলোয় আলোকিত হতে দাও। এ উদ্দেশ্যেই তুমি আমাকে জোর করে রেখেছিলে। কিন্তু এসব কথা তার ওপর কোন প্রভাব ফেলে নি। সে মৌলভীদের কুমন্ত্রণায় পড়ে একদিন রাগ করে বলে, "ছয় মাসের মধ্যে এখান থেকে বের হয়ে যাবেন অন্যথায় সবকিছু বাইরে ফেলে দেব।"

এরপর হযরত মৌলভী সাহেব বলেন, "আমাকে কি তুমি বাইরে ফেলবে। আমি এখানের হয়ে গেছি। তোমাকে খোদা এরূপভাবে তুলে ফেলবেন এবং গায়েব করবেন যে, আর কখনো তোমাকে দেখা যাবে না। তোমার দেখার জন্য তোমার ছেলে মেয়ে এবং বংশধররা সব সময় ব্যাকুল থাকবে। মৌলভী সাহেব যেমন বলেন, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর কুদরতের নিদর্শন দেখিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে নিখোঁজ ও গায়েব করেন। অনেক খোঁজ-খবর করেও তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ হযরত মাওলানা মাহবুব আলম যেকথা বলেন আল্লাহ্‌তাআলা তা পুরো করে দেখান।

দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন ঃ

আল্লাহ্‌তাআলা যেমন হযরত মৌলভী সাহেবের মুখ থেকে বার হওয়া কথাকে পূর্ণ করে তার সত্যতা প্রকাশ করেন তেমনি তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শনও দেখান।

হেফাযতকারী বাঘ ঃ

হযরত মৌলভী সাহেব দিন রাত দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজে সফর করতেন। সফরের সময় হিংস্র বন্য জন্তু-জানোয়ার সামনে আসতো। তিনি দোয়া করতেন, "হে করুণাময় প্রভু! হেফাযতের উপকরণ দাও"। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেন। বাঘ তাঁর হেফাযতের জন্য আদিষ্ট হয়। তাঁর এক শিষ্য নির্জন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সফরে তাঁর সঙ্গী হয়। এ সময় বাঘ এসে উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, "ভয় নেই, এ বাঘ তোমাকে কিছু বলবে না। একে খোদা আমার হেফাযতের জন্য মনোনীত করেছেন। এ আমার ডাইনে বাঁয়ে, সামনে, পিছনে চলে যাতে জঙ্গলের অন্য হিংস্র-প্রাণী আমার ক্ষতি না করে। যখন কোন লোকালয় আসে তখন এ ফিরে যায়। শিষ্য একথাতে আশ্বস্ত হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বান্দা মসীহ্ মাওউদের (আঃ) গোলামের হেফাযতের জন্য বাঘকে মনোনীত করেছেন।

কোটলীতে আহমদীদের হেফাযত ঃ

আজাদ কাশ্মীরের কোটলীতে আহমদীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিরোধিতা হয়। তাঁর এক সফরের সময় মসজিদ থেকে প্রচার করা হয় মাহবুব আলমকে যে বাড়ীতে আশ্রয় দেবে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এলাকার লোকেরা এ প্রচারের ফলে খুবই ভীত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাঁকে বারণ করা যাচ্ছিল না আবার গ্রহণ করাও যাচ্ছিলো না। অবশেষে তাঁকে ভালবাসে এরূপ এক বিশেষ শিষ্যের বাড়ীতে তিনি যান। তিনি তাকে ফতোয়ার কারণে বিব্রত দেখে বলেন, "তোমার ভয়ের কারণ নেই। আমি তোমার ঘরের মধ্যে যাব না। উঠানের চত্বরে রাত কাটিয়ে দেব"। তিনি বলেন, "ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসের শীতে আপনি কীভাবে জীবিত থাকবেন।" হযরত মৌলভী সাহেব বলেন, "আমি মরবো না, উপরন্তু তোমাকে জীবিত করবো।" হযরত মৌলভী সাহেব সারারাত উঠানের চত্বরের ওপর দোয়া করে কাটান। সকালে বাড়ীর মালিক উঠে তাঁকে নামাযের মুসল্লার ওপর বসে আল্লাহ্‌তাআলার তসবীহ্ ও তাহমীদ করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান।

তিনি বলে ওঠেন, তাঁর জীবিত থাকা আল্লাহ্‌তাআলা এক বড় নিদর্শন। তিনি মাওলানা সাহেবের পদতলে এসে বলে ওঠেন, আমি আপনার সাথে আছি।

তাঁর এই প্রচন্ড শীতের রাতের দোয়া আল্লাহ্‌তাআলা গ্রহণ করেন। যার ফলে কোটলীতে জামাত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। চত্তরওয়ালা বাড়ীর তিন ভাই মিয়াঁ করমদ্দীন, ঘোঘর মরহুম, মুন্সী আলম দীন (৭৪ সালে খোদার রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করেন)। মাটোর আলীফ দীন মরহুম ও আজাদ কাশ্মীরের সাবেক রিজিওনাল আমীর হাজী আমীর আলম মরহুম হযরত মৌলভী সাহেবের জীবিত থাকার নিদর্শন দেখেন। এতে প্রভাবিত হয়ে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলাহ্‌তে অন্তর্ভুক্ত হন। এ ঐতিহাসিক চত্তর সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান ইমাম হযরত সাহবেযাদা মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) খেলাফতের পূর্বে তাঁর আজাদ কাশ্মীর পরিদর্শন কালে এই চত্তরের ওপর দু'রাকাত নফল নামায আদায় করেন। এখন এ মঞ্চের স্থানটিতে মিঁয়া করমদীন মরহুমের বংশের মহিলারা করম দীন সাহেবের পৌত্র মোহতারম নাসির আহমদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে একটি ছোট ঘর তৈরী করেছে। এর নাম রাখা হয়েছে

"বায়তুল ইয়াদগার"।

মৃতপ্রায় রোগী সুস্থ হ'ল ঃ

এক দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগীর পরিবারের লোকেরা তার বাসন কোসন আলাদা করে ঘরের বাইরে এক ঝুপড়ীতে রেখে দেয়। দুর্গন্ধে তার কাছে কেউ আসতো না। এমনকি খাবার জিনিসপত্র দূর থেকে তার কাছে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হ'ত।

হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে এ খবর পৌছানোর সাথে সাথে তিনি সেখানে যান। গিয়ে দেখেন যে মৃতপ্রায় এক কঙ্কাল পড়ে পড়ে আছে। তিনি নিজের হাতে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। তার অবস্থা অনুসারে বাড়ী থেকে তার খাবার দেয়া শুরু করেন। তার পরিবারের লোকদের বোঝানোর জন্য যে, এ ব্যক্তি ঘৃণার যোগ্য নয় বরং দয়ার যোগ্য। তিনি নিজে তার সাথে কয়েক বার খাবার খান। অনেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কেন কুষ্ঠ রোগীর সাথে খেলেন। তিনি উত্তরে বলেন, শারিরীক কুষ্ঠ রোগীদের চেয়ে আধ্যাত্মিক ও হৃদয়ের কুঠেরোগীরা বেশি ভয়ংকর। মৌলভী সাহেব যেহেতু একজন হেকিম ছিলেন সেজন্য তিনি ঔষধও দিতেন। বিগলিত হৃদয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তার জন্য দোয়াতে কাটান। খোদা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং মৃত প্রায় কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দেন। এটি তাঁর কবুলিয়তে দোয়ার এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

পাহাড় টুকরো টুকরো হওয়া ঃ

একবার হযরত মৌলভী সাহেবের ওপর ভীষণ অত্যাচার করা হয়। দুঃখপূর্ণ এই ভয়ংকর রাত তিনি ক্রন্দনপূর্ণ দোয়াতে কাটান। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বেদনাপূর্ণ দোয়াকে কবুল করেন এবং স্বপ্নে দেখান যে, "বড় পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পড়েছে।" তিনি বলেন, আল্লাহ্‌তাআলা আমার মিনতি শুনেছেন এবং আমাকে খবর দিয়েছেন যে, বড় বড় হিংসুটে লোকেরা মারা যাবে আর আহমদীয়তের মহান বিজয় আসবে। সেরূপই হয়। আহমদীয়তের শত্রুরা ধ্বংস হয় এবং এ এলাকা আহমদীয়তের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়।

শত্রুরা অধঃপতিত - এখানে থাক ঃ

একবার অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে হযরত মৌলভী সাহেব দোয়া করেন, "হে প্রভু, শত্রুরা অত্যাচারের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। এ পাথুরে জমির পরিবর্তে আমাকে উর্বর জমি দাও" তিনি এ সময়ে নিজের মাতৃভূমি গুজরাতে গিয়ে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিকল্পনা করেন। আল্লাহ্‌তাআলা এ দোয়াকে অন্যরূপে কবুল করেন এবং ইলহামের দ্বারা সুসংবাদ দেন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন, "লেখক, যিনি পাহাড়ের মোবাল্লেগ বিরোধীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ইউনুসের (আঃ) মত দেশ ত্যাগ করার মনস্থ করেন। তখন ২টি ইলহাম হয়। একটি- তুমি এখানে থাক। অন্যটি- সব লোক ধংস হবে। অর্থাৎ বিরোধিরা অধঃপতিত হবে। তাই হয়েছে। আমি কত বছর এখানে আছি। আর আমার বিরোধিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছে।"

তাঁর কাব্য চর্চা ঃ

হযরত মৌলভী সাহেব ফার্সী ভাষার শক্তিশালী কবি ছিলেন। আরবী ও উর্দূতেও তাঁর কিছু কবিতা আছে। কিন্তু তাঁর ফার্সী কবিতা বিশেষভাবে সমাদৃত। দুঃখজনক যে, ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার সময় তাঁর বিরাট পাঠাগারের সাথে সাথে তাঁর সম্পদও বিনষ্ট হয়। বরাহীনে আহমদীয়ার ৪র্থ খন্ডে ও রূহানী খাযায়েনের ১ম খন্ডের ৬৭২ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি কবিতা আছে।

পায়ে ওস্তাদ আল লাযাঁ চৌবেঁ বুঁদ
পায়ে চৌবে শখত বে তমকীন বুঁদ।

এক মূল্যবান উপদেশ ঃ

কাশ্মীর রাজ্যের অনেক ধনী লোক হযরত দাদা জানের (হযরত মৌলভী সাহেব লেখকের দাদা) খেদমতে জমিজমাও সম্পদ পেশ করেন। কিন্তু তিনি কোন দান গ্রহণ করেন নি। টায়ে মনকটের এক ধনী চৌধুরী কাল্লাখান নম্বর দার হযরত মৌলভী সাহেবের খেদমতে তার নিজের জমির এক বিস্তৃত অংশ গ্রহণ করার জন্য এক চিঠিতে অনুরোধ করেন। তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, "আপনি কি চান এরূপ আমি জমি জমা ও সম্পদ জমা করে আমার সন্তানদের ও বংশধরদের শাসকদের সেবক তৈরী করি। আমি কি গুজরাতে আমার যে জমি ও জায়গীর ছিল তা ধ্বংস করে দেই নি। আপনার দানের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি উহা গ্রহণ করবো না। আমার বংশধররা আল্লাহ্‌র কালামের জন্য উৎসর্গীকৃত। দীনের সেবক থাকবে এবং আকাশ থেকে রিযিক পাবে।"

সুতরাং এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাঁর দুই ছেলেই মাওলানা আহমদ দীন ও মাওলানা আব্দুর রহমান নিজেদের জীবন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করেন।

হযরত মৌলভী সাহেব উচ্চমানের হেকিম ছিলেন। অনেক অ-চিকিৎস্য রোগী তাঁর চিকিৎসায় অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়েছে। এরূপ রোগীদের দেখে ডাক্তাররাও অবাক হয়ে যেত।

খলীফায়ে ওয়াক্তের আনুগত্য ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) নির্দেশ পালনের জন্য হযরত মাওলানা মাহবুব আলম এরূপভাবে দায়ী ইলাল্লাহ্‌র কাজে মগ্ন হন যে, নিজের মাতৃভূমিকে ভুলে যান। হুযূর (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর মনে নিজের মাতৃভূমি গুজরাতে ফেরত যাওয়ার চিন্তা আসে। আর **ওয়ানজির আসিরাতাকাল আকরবীন** এই ঐশী আদেশ পালনার্থে তিনি গুজরাতে এসে নিজের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট আহমদীয়তের সংবাদ পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করার জন্য তিনি খলীফা আওওয়ালের (রাঃ) খেদমতে অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত খলীফা আওওয়াল (রাঃ) তাঁকে অনুমতি না দিয়ে বলেন, "কাশ্মীর রাজ্যে আপনি আহমদীয়তের তবলীগ, তা'লীম ও তরবিয়তের যে নেযাম প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আপনি ছাড়া আর কে চালাতে পারে। এজন্য আপনার ওখানেই থাকা উত্তম।" খলীফায়ে ওয়াক্তের এ আদেশ তিনি অবনত মস্তিষ্কে গ্রহণ করেন এবং নিজের মাতৃভূমি চিরদিনের মত ভুলে যান। পরে এর চিন্তাও কোন দিন মনে আনেন নি। কাদিয়ানে সালানা জলসার সময় আসা কিম্বা যাওয়ার পথে কিছুদিন আবশ্যিক তবলীগের কাজে গুজরাতে অবস্থান করতেন। এ পর্যন্তই।

ভৃত্য ও প্রভুর মধ্যে অর্থাৎ হযরত মৌলভী মাহবুব আলম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মধ্যে ভালবাসাপূর্ণ যে সব চিঠি বিনিময় হয় তা-ও ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় সংরক্ষণ করা যায় নি। ফলে তাঁর লেখার কোন অংশ নিদর্শন হিসাবে মজুদ নেই।

মৃত্যু ঃ আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মাওলানা মাহবুব আলমকে ইলহাম, কাশ্‌ফ ও রোইয়ার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানান। ১৯২৩ সালের সালানা জলসায় আসার পূর্বে তাঁর ওপর এক ইলহাম হয়, **লা রাআদ্দুকা ইলা মায়াদ**। এ ইলহাম তিনি অনেক বন্ধুকে শোনান এবং বলেন এখন আকাশের প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার সময় হয়ে গেছে। জলসা সালানাতে আসার সময় নিজের ঘরে এক টুকরা কাগজের চিরকুটে লিখে রেখে যান "খোদা হাফেয, আর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়"।

জলসা সালানাতে যোগদানের পর মৌলভী সাহেব গুরজরাতের চকপিরানায় তাঁর পৈত্রিক বাড়ীতে আসেন। সামান্য অসুস্থতার পর মৃত্যুবরণ করেন।

সন্তান-সন্ততি ঃ তাঁর দুই ছেলে মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব ও মৌলভী আহমদ দীন সাহেব। মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব নিয়ম মাফিক জীবন উৎসর্গকারী। নিজের পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দায়ী ইলাল্লাহ্‌র কর্তব্য আদায় করতে থাকে।

[নোট ঃ হযরত মৌলভী সাহেবের এক নাতি (মৌলভী আব্দুর রহমানের ছেলে) মাওলানা আব্দুল ওহাব আহমদ শাহেদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ আহমদীয়া এ প্রবন্ধের লেখক]।

ভাষান্তর ঃ **কওসার আলী মোল্লা**

হযরত মূসা (আঃ)

(শেষ কিস্তি)

কুরবানী ঃ একদিন হযরত মূসা (আঃ) তার কওমকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ দিতেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টার পাত্র পেয়েছ?

তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি যাতে আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

তারা বলল, তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহা কীরূপ।

হযরত মূসা (আঃ)বললেন, তিনি বলছেন, উহা এমন একটি গাভী, যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কাও নয়, বরং ঐ দু'এর মাঝামাঝিপূর্ণ যৌবনা, সুতরাং তোমাদিগকে যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তা পালন কর ।

তারা বলল, তুমি আমাদের জন্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহার রং কী।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, উহা একটি হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

তারা বলল, তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদেরকে অবহিত করেন যে, উহা কীরূপ; কারণ আমাদের নিকট সকল গাভী পরস্পর একই রকম মনে হচ্ছে এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হব।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ বলছেন, উহা এমন এক গাভী না উহাকে ভূকর্ষণের জন্য হালে জোতা হয়েছে, না উহাকে খেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, উহা সুস্থ কায়া উহাতে কোন দাগ নেই।

তারা বলল, তুমি এখন প্রকৃত বিষয় পেশ করেছো। তখন তারা উহাকে জবাই করল, যদিও তারা ইহা করতে ইচ্ছুক ছিল না।

শপথ নামা ঃ হযরত মূসা (আঃ) তার জাতির নিকট থেকে যে শপথ নিয়েছিলেন, তাহ'ল এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না, এবং সদয় ব্যবহার করবে পিতা-মাতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে এবং এতীমদের সাথে এবং মিস্‌কীনদের সাথে এবং তোমরা লোকের সাথে সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে, তোমরা একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং নিজ জাতির লোকদেরকে স্ব স্ব গৃহ থেকে বহিষ্কার করবে না। এবং তারা ইহা স্বীকার করেছিল এবং মেনে নিয়েছিল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর স্বপ্ন ঃ একদিন হযরত মূসা (আঃ) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি তার যুবক সঙ্গীকে বলছেন, আমি যে পথে চলছি সে পথে চলায় বিরত হব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দু'সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছবো, অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।

যখন তারা উভয়ে দু'সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছলো, তখন তাঁরা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন, এবং উহা দ্রুত বেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরল। যখন তাঁরা সে স্থান অতিক্রম করে আগে বেড়ে গেলেন, তখন তিনি তাঁর যুবককে বললেন, আমাদের নিকট আমাদের সকালের খাবার আন, আমরা আমাদের এ সফরের জন্য খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সে বলল, বলুন তো এখন কি উপায় হবে যখন আমরা সে পাথরের উপর বিশ্রাম করবার জন্য অবস্থান করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি এবং আমাকে এ কথা আপনার নিকট উল্লেখ করতে শয়তান ব্যতীত আর কেউ ভুলায় নি, এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজ পথ ধরেছে।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, উহাই সে স্থান আমরা যার অনুসন্ধানে ছিলাম। অতঃপর তারা উভয়ে নিজদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে ফিরে গেলেন। তখন তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পেলেন যাকে আল্লাহ্ তাঁর নিকট থেকে রহমত দান করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সন্নিধান থেকে তাকে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেন, আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে যে, আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে উহা থেকে কিছু হেদায়াত আপনি আমাকেও শিক্ষা দিবেন?

বুযূর্গ বললেন, তুমিতো আমার সাথে কখনও ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত কর নি উহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করবেই বা কীরূপে ?

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, যদি আল্লাহ্ চান তাহলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশের অবাধ্যতা করবো না। বুযূর্গ বললেন, আচ্ছা যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তাহলে তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যে পর্যন্ত না আমি স্বয়ং তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলি। তারা উভয়ে যাত্রা করলেন, এমন কি যখন তারা এক নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন বুযূর্গ উহাতে ছিদ্র করে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনি কি এর আরোহীদিগকে ডুবাবার উদ্দেশ্যে ছিদ্র করেছেন? আপনি নিশ্চয় এক গুরুতর কাজ করেছেন। বুযূর্গ বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নি যে, তুমি আমার সাথে কখনও ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনি আমাকে উহার কারণে ধৃত করবেন না যা আমি ভুলে গিয়েছি। অতএব আমার বিচ্যুতির দরুন আপনি আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করবেন না। পুনরায় তারা যাত্রা করলেন, এমন কি যখন তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, তখন বুযূর্গ তাকে হত্যা করে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনি কি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে অন্য কাকেও হত্যার অপরাধ ব্যতিরেকে হত্যা করেছেন। নিশ্চয় আপনি এক অতি মন্দ কাজ করছেন।

বুযূর্গ বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আমি যদি এরপর আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না, কারণ আপনি আমার পক্ষ থেকে ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছেন।

অতঃপর তারা যাত্রা করলেন এমনকি তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছলেন। তারা উহার অধিবাসীদের নিকট কিছু খাবার চাইলেন কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। তখন তারা উহার মধ্যে এমন এক প্রাচীর পেলেন যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, সুতরাং বুযূর্গ উহাকে খাড়া করে দিলেন।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে নিশ্চয় এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

বুযূর্গ বললেন, এ হ'ল আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পার নি, আমি এখন তোমাকে এর তত্ত্ব অবগত করছি।

নৌকাটির বিষয় হ'ল এই; ইহা ছিল কয়েক জন নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তির যারা সমুদ্রে কাজ - কর্ম করত, এবং তাদের পশ্চাতে ছিল এক যালেম বাদশাহ্ যে প্রত্যেক নৌকা বলপূর্বক ছিনিয়ে লইত, এ জন্য আমি উহাকে খুঁতযুক্ত করে দিতে চাইলাম।

এবং বালকটির ঘটনা এই যে, তার পিতা-মাতা উভয়ে ঈমানদার ছিল; এবং আমরা আশংকা করলাম যে, সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিদ্রোহাচরণ ও কুফুরী করে তাদিগকে কষ্ট দেবে। অতএব আমরা ইচ্ছা করলাম যেন তাদের প্রতিপালক তাদিগকে তার স্থলে তার অপেক্ষা পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়া-মমতায় ঘনিষ্টতর পুত্র দান করেন। আর বাকি রইল সেই প্রাচীরের কথা, উহা আসলে সেই শহরের দু' এতীম বালকের সম্পত্তি ছিল এবং উহার নীচে তাদের জন্য প্রোথিত ধন-ভান্ডার ছিল এবং তাদের পিতা ছিল একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। সুতরাং তোমার প্রভু-প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যেন তারা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং তারা তাদের ধন-ভান্ডার নিজেরা বের করে নেয়। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতস্বরূপ। বস্তুত আমি ইহা আমার নিজ ইচ্ছায় করি নি। ইহাই হ'ল সে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা যার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পার নি।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ ১। এই ঘটনাটি ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর ইস্‌রা (আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণ)। এই ভ্রমণ দৈহিক ছিল না, ইহা ছিল এক আধ্যাত্মিক বা রূহানী অবস্থা, যার মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ)-কে রক্ত মাংসের দেহ থেকে বিস্মৃত করে গভীর রূহানী মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল।

২। "মাজমায়াল বাহ্‌রায়ন" অর্থ ঃ দু'সমুদ্রের সংগমস্থলে। এখানে দু'টি বিধানের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র বুঝায়। যথা- মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়তে সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র।

৩। 'যুবক সঙ্গী' শব্দটি হযরত ঈসা (আঃ)-কে বুঝায়।

৪। আমি (পথে চলতেছি সে পথে) চলায় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দু'সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে পৌঁছি" এ বাক্য প্রকাশ করছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুবক সঙ্গী তাঁর ভ্রমণের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের ১৪শ' বছর পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন হয়েছিল।

৫। "অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।" এ শব্দগুলি ব্যক্ত করছে যে, মুসায়ী শরীয়ত বহু শতাব্দী ব্যাপী কার্যকর থাকবে বা চালু থাকবে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় থেকে আরম্ভ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত। যখন মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেল, এ সময় কালের ব্যাপ্তী দু'হাজার বছরের উর্ধ্বে।

৬। "হূত" অর্থ ঃ মাছ। কাশ্‌ফে মাছ দেখার ব্যাখ্যা ধার্মিক লোকগণের ইবাদত গৃহ (তা'তিরুল আনাম) এ অর্থে যখন মুসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়ত মিলিত হবে, অর্থাৎ মুসায়ী বিধান যখন সক্রিয় থাকবে না, যখন ইসলামী শরীয়ত কার্যকরী হবে, সে সময়ে হযরত মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীগণ থেকে প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা উঠে যাবে।

৭। কাশ্‌ফে নাস্তা বা সকালের খাদ্য চাওয়ার অর্থ 'ক্লান্তি'। দু'সমুদ্রের সংগমস্থল অতিক্রম করার পর এবং দীর্ঘকাল তাঁরা পৃথকভাবে ভ্রমণ করে এবং প্রতিশ্রুত নবীর জন্য ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর যুবক সঙ্গী বিস্ময়ে ভাবতে শুরু করবে যে, তিনি (প্রতিশ্রুত নবী) হয়ত পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) এবং তার যুবক সফর সঙ্গী (ঈসা আঃ)।

৮। 'সাখরাহ্' অর্থ পাথর। কাশ্‌ফ এবং স্বপ্নের ভাষায় এর অর্থ অধর্ম এবং পাপময় জীবন। অতএব যখন আমরা সে পাথরের উপর বিশ্রাম করবার জন্য অবস্থান করেছিলাম, এ কথাটির মর্ম হ'ল, যখন দু'সমুদ্র মিলিত হবে, অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত শেষ প্রান্তে পৌঁছবে এবং এক নতুন নবী এবং নতুন শরীয়ত প্রকাশিত হবে, ইহুদী ও খৃষ্টান জাতি তখন অপরাধ বৃত্তি ও পাপাচারে মগ্ন থাকবে। 'এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে পথ ধরল' এ বাচনভঙ্গী প্রকাশ করছে যে, প্রকৃত সাধুতা এবং খোদাতাআলার ইবাদত ইহাদের নিকট থেকে বিস্ময়করভাবে বিদায় নেবে।

৯। তখন তারা এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পেল। কে এই 'আল্লাহ্‌র বান্দা' যার উপর আল্লাহ্‌তাআলা অনুগ্রহ করেছিলেন এবং যাকে তিনি বিশেষ শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং যার সন্ধানে, ঐশী নির্দেশ অনুসারে হযরত মূসা (আঃ) এতদীর্ঘ ও কষ্টকর সফর করেছিলেন এবং কে বিখ্যাত কেন্দ্র বিন্দু এবং সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র? তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া আর কে? তাঁরই আত্মা দৈহিকরূপে রূপে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাশ্‌ফে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। এবং নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যেমন বর্ণিত হয়েছে, মূসা কি ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছিলেন! যদি তিনি এরূপ করতেন, তাহলে আমরা অধিক পরিমাণে গায়েবের জ্ঞান দ্বারা অনুগৃহীত হতাম' (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)।

১০। হযরত মূসা (আঃ)-কে সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয় নি যেখানে রসূলে আকরাম (সঃ) পৌঁছেছিলেন।

১১। "সে-ই উহাতে ছিদ্র করেছিল" স্বপ্নের ভাষায় যার অর্থ পার্থিব ধন-সম্পদ, অর্থাৎ তিনি এদিকে নজর দিবেন যাতে অর্থ-সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয় বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়।

১২। 'গুলামুন' অর্থ কিশোর বা যুবক. স্বপ্নে বা কাশ্‌ফে দেখলে অর্থ হয় অজ্ঞতা, শক্তি ও পশু বৃত্তি। এখানে পিতা-মাতা হয়েছে দেহ এবং আত্মা। কারণ উৎস (বা পিতা + মাতা) থেকেই সন্তান গুণাবলী প্রাপ্ত হয়।

১৩। এতীমদ্বয় হয়েছে মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)। তাঁদের ধার্মিক পিতা হয়েছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁর শিক্ষারূপী ধন-সম্পদ তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ লোকের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অধার্মিক আচরণের কারণে উহা হারিয়ে ফেলেছিল। এ সম্পদের ভান্ডার কুরআন মজীদে সংরক্ষিত হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যেন তারা কুরআনের শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি এবং গ্রহণ করতে পারে।

(কুরআন মাজীদের বাংলা তফসীরের আলোকে)

সংকলন ঃ **মোঃ হেলাল উদ্দীন আহমদ**

খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

সূরাতুন নূরের সপ্তম রুকূর আয়াতে ইস্তিখলাফ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, তাদের মধ্যে খিলাফত থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং যে ওয়াদা করেছেন তা কোন দিন টলতে পারে না। আমাদের অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ্‌র যাদের মধ্যেই খিলাফত থাকবে ধরে নিতে হবে যে, তারাই মুত্তাকী। আর কুরআনের এই আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা মানবীয় প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব নয়।

খিলাফত তিন শ্রেণীর। পবিত্র কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেও এই তিন প্রকারের সত্যাসত্য নিরূপিত হয়। প্রথমঃ যাঁরা একই সঙ্গে নবী ও খলীফা। যেমন - হযরত আদম (আঃ)-(২ঃ৩১)। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা নবী হয়েও তাঁদের চাইতে কোন বড় নবীর খলীফা। যেমন- বনী ইস্রাঈলী নবীগণ (আঃ) (৩৮ঃ২৭)। তৃতীয়ত ঃ যাঁরা নবী নন, নবীর খলীফা। যেমন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং অন্যান্য খলীফাগণ (২৪ঃ৫৬)।

সূরা নূরের যে আয়াতটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা "তোমাদের" বলতে বুঝিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে এবং "পূর্ববর্তীদের" বলতে উম্মতে মূসাকে। হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে তওরাতের অনুবর্তিতায় খলীফা ছিলেন হযরত হারূন (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত প্রত্যেকেই। খেলাফতের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থ ঃ "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সমবেতভাবে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (৩ঃ১০৪)।

আমরা দেখেছি মুসলমানগণ যখন আল্লাহ্‌কে ভুলে খিলাফতের আদর্শকে ভুলে গিয়েছে তখনই খিলাফতের ব্যবস্থাপনা এই পৃথিবী থেকে উঠে গিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সঃ) এ ব্যাপারে সতর্কবাণী অনেক আগেই বর্ণনা করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন - নোমান বিন বশীর হোজায়ফা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন- রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততদিন বর্তমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্‌তাআলা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্‌তাআলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম হবে। এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ্‌তাআলা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ্‌তাআলা চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন পুনরায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে (আহমদ বায়হাকী)।

এই আখেরী যুগে এসে যদি আমরা উপরোক্ত হাদীসটির দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত আহমদীয়তের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কথা কত বড় নিদর্শনসহ প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাফত অব্যাহত রাখার ঐশী পরিকল্পনা কেউ ব্যর্থ করতে পারবে না।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ

"তুমি কখনও ধারণা করো না যে, যারা অস্বীকার করেছে, তারা পৃথিবীতে আমাদেরকে (আমাদের পরিকল্পনাকে) ব্যর্থ করতে পারবে" (২৪ঃ৫৮)।

খিলাফত আল্লাহ্‌র ঐশী ব্যবস্থাপনা। খলীফা বা ইমামকে মানার গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন-

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে না মেনে মারা যাবে, সে জাহেলিয়্যতের মৃত্যুবরণ করবে" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেন- "খোদাতাআলা দুই প্রকারের কুদরত (বা শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। ১। প্রথমতঃ নবীগণের দ্বারা তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। ২। দ্বিতীয়ত ঃ অপর হস্ত এরূপ সময়ে প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করে থাকে যে, এখন নবীর কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের এই প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত (ধরাপৃষ্ঠ হইতে) বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হইয়া যায়। তখন খোদাতাআলা দ্বিতীয়বার আপন মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহারা খোদাতাআলার এই মো'জেযা প্রত্যক্ষ করে। ... অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তাআলার বিধান ইহাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া দেখান; সুতরাং এখন ইহা সম্ভবপর নহে যে, খোদাতাআলা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, ইহা স্থায়ী, যাহার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না হওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলিয়া যাইব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করিবেন যাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নহে বরং উহা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতাআলা বলিতেছেন-

'আমি তোমার অনুবর্তী এই জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দিব' (আল্ ওসীয়্যত)।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর উক্তির সত্যতা আমরা দেখেছি। এতক্ষণ খেলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি। এ পর্যায়ে খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। প্রথম দিকে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তৎপর খলীফাতুল মসীহ্দের সময়কার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মৃত্যুর পর চারিদিকে বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্বলিত হলে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে দুর্বল মনে করা হয়েছিল। কিন্তু খোদার ফযলে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই বিদ্রোহই শুধু দমন করেন নি উপরন্তু ইসলামী সালতানাতকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান। হযরত উমর (রাঃ) রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন সাধিত করেন। বিভিন্ন করারোপ, বায়তুল মাল ও মজলিসে শূরা প্রবর্তন করেন। হযরত উমরের (রাঃ) সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্য সুদূর রোম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময়ে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সেই কংকণ যা ইরানের বাদশাহ্ পারভেজের, তা পড়ানো হয় হযরত উমর (রাঃ)-এর সময়ে শুরাকাকে। উসমানের (রাঃ)-এর সময়ে সবচেয়ে বড় যে কাজ সাধিত হয় তা হলো পবিত্র কুরআনের সংকলন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সময়েও ইসলামের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মৃত্যুর পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর (আঃ) লাশ দাফনের পূর্বেই। খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) খিলাফতের ব্যবস্থাপনাকে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রাঃ) বলেছেন -

"The greatest single event of the period of the Khilafat of Hazrat Khalifatul Masih 1, was his courageous and valient defence of the institution of khilafat, and the upholding of its dignity and authority.'

(Ahmadiyyat - the Rennissance of Islam P.206)

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর সময়ে কুদরতে সানিয়া ইসলামী খেলাফতের পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে। মজলিসে শূরা, বায়তুল মাল, খোদ্দামুল আহমদীয়া, আতফালুল আহমদীয়া, নাসেরাতুল আহমদীয়া, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আনসারুল্লাহ্, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ সহ নানা প্রকার প্রোগ্রাম ও অঙ্গ-সংগঠন দাঁড় করিয়ে তিনি আহমদীয়া আন্দোলনকে একটি শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুত পুরুষ, মুসলেহ মাওউদ এবং ফযলে উমর। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর সময়ে পবিত্র কুরআনের অনুবাদে বিশেষ মনযোগ দেয়া হয় এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শতবর্ষ পালনের জন্য দোয়া, তাহাজ্জুদ সহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়। তাঁর আমলে আফ্রিকায় বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মিত হয়। নুসরত জাঁহা স্কীম, ফযলে ওমর ফাউন্ডেশন ইত্যাদি তাঁর অনন্য অবদান। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে আহমদীয়ত শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানে আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার পর আবার ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধা সম্পর্কিত আইন পাস করা হয়। এতে করে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) লন্ডনে হিজরত করেন। এবং এরপর জামাতের উন্নয়নের গতিধারা আরো বেড়ে যায়। MTA অর্থাৎ MUSLIM TELEVISION AHMADIYYA স্থাপনের মাধ্যমে অহোরাত্র ইসলামের পবিত্র কলেমা প্রচার করে চলেছে এই টি.ভি চ্যানেল। কোনরূপ বিজ্ঞাপন ছাড়াই শুধুমাত্র দরিদ্র আহমদীদের চাঁদা দ্বারা চলছে এই টি. ভি. এর কার্যক্রম। "ওয়াকফে নও" কার্যক্রমও খিলাফতের আরেকটি সাফল্য। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে নেয়া হয়। প্রতিবছর গাণিতিক হারে বিশ্বব্যাপী বয়াত হচ্ছে। এ বছর ৮ কোটিরও বেশি লোক এমটিএ এর মাধ্যমে হুযূর আকদস (আইঃ)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়তে দাখিল হয়েছে।

খেলাফতের অসীম গুরুত্ব ও কল্যাণে ইসলামের বিশ্ব বিজয় হবে। আমরা সেই দিনের জন্য খিলাফতের অধীনে থেকে কাজ করছি ও দোয়া করছি।

আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিঁ ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম - ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আমীন।

- মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবীব (জয়)

খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত

হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসীহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রয়েছে। নবুওয়ত একটি বীজ বপন করে যার পর খেলাফত উহার 'তাসীর' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। তোমরা খেলাফতে হাক্কাকে মজবুতির সাথে ধর এবং উহার আশিস ও বকরতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর যাতে খোদাতাআলা তোমাদের উপর দয়া ও রহমত বর্ষণ করেন, এবং তোমাদিগকে এই জাহানেও উন্নত করেন, এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের অঙ্গীকার পূরণ করে যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানদিগকেও তাঁদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাতে থাকো। আহমদীয়তের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের প্রকৃত সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং দুনিয়াতেও খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন" [সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ), আল্ ফযল, ২০শে মে, ১৯৫৯ইং]।

খুলনা রিজিওনের ওয়াক্‌ফে নও তালীম-তরবিয়তী ক্লাস ও ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন ২০০২

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ রহমতে গত ২৩শে মার্চ, ২০০২ হতে ২৭শে মার্চ, ২০০২ এই ৫দিন ধরে খুলনা রিজিওনের ৪র্থ বার্ষিকী ওয়াকফে নও তালীম-তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন, ২০০২ সাফল্যজনকভাবে মসজিদে বাইতুস্ সালাম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত হলো, আল্ হামদুলিল্লাহ্।

পাঁচ দিনের এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, বাংলাদেশ। এ ছাড়াও অত্র রিজিওনের রিজিওনাল সেক্রেটারী জনাব জিএম মতিয়ার রহমান ও জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান (মুকুল), সহকারী রিজিওনাল সেক্রেটারী। আরও উপস্থিত ছিলেন অত্র রিজিওনের ক্যারিয়ার এ্যান্ড প্লানিং কমিটির সদস্য জনাব এস এম, আবু কওছার (আমীর, সুন্দরবন), জনাব এস এম, রেজাউল করীম (জিএস, সুন্দরবন), জনাব জি এম, মোবারক আহমদ (সেক্রেটারী, ওয়াকফে নও, সুন্দরবন) ও জনাবা আরিফা এদিব চৌধুরী।

তালীম-তরবিয়তী ক্লাসের প্রিন্সিপালের দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা আব্দুল আওওয়াল খান চৌধুরী। ক্লাস পরিচালনায় শিক্ষক ছিলেন অত্র রিজিওনে কর্মরত মোয়াল্লেম জনাব এনামুল হক-রনি, জনাব শেখ আব্দুল ওয়াদুদ বাবলু, জনাব ফরহাদ হোসেন, জনাব মনির হোসেন খান ও জনাব নাসের আহমদ আনসারী।

এতে ৩২ জন ওয়াকেফীনে নও শিশু, ৪৮ জন পিতা-মাতা ও ছোট ছোট বালক-বালিকাসহ মোট ১১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ করা হয় ২৭শে মার্চ, ২০০২ইং রোজ বুধবার বিকাল ৩-৩০ মিঃ থেকে ৬-৩০ মিনিট পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন ঃ

১। মাহমুদ আহমদ (পল্লব) ৪র্থ – ৫ম শ্রেণী–১ম স্থান
পিতা - এস এম আবু আহমদ (সুন্দরবন)

২। শেখ ওজিহুর রহমান (কল্লোল) ৩য়–৪র্থ শ্রেণী – ১ম স্থান।
পিতা - শেখ মাহফুজুর রহমান (মুকুল) - সুন্দরবন

৩। এজাজুর রহমান (শুভ) ৬ষ্ঠ – ৭ম শ্রেণী - ২য় স্থান।
পিতা এম শামসুর রহমান (খুলনা)

৪। রহিমা আফসানা – ১ম – ২য় শ্রেণী–২য় স্থান
পিতা - শেখ আব্দুল ওয়াদুদ - (সুন্দরবন)।

শেখ মাহফুজুর রহমান মুকুল, চেয়ারম্যান
৪র্থ বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলন '০২
খুলনা রিজিওন

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ২য় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা

গত ১০/০৪/২০০২ইং তারিখ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর রিজিওনাল কায়েদ ও জেলা কায়েদদের নিয়ে দিনব্যাপী ২য় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর লাইব্রেরী কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পূর্ববর্তী তিন মাসের কার্যাবলীর উপর পর্যালোচনা ও পরবর্তী তিন মাসের কাজের টার্গেট দেয়া হয়। উক্ত সভায় ৪ জন রিজিওনাল কায়েদ, ১০জন জেলা কায়েদ এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর আমেলার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভাটি মোহতরম সদর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

মোঃ মুহিবুর রহমান
এডিশনাল মোতামাদ-২
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

মসীহে মাওউদ (আঃ) দিবস পালন

আরও যারা পরবর্তীতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবসের কর্মসূচী পালন করেছেন তারা হলেন, দিনাজপুর জামাত, সুন্দরবন জামাত, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা ও মীরপুরের খোদ্দাম ও আনসারের মজলিস (যোথভাবে)।

- আহমদী বার্তা

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চট্টগ্রাম জেলার ১ম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ রহমতে ২১ ও ২২শে মার্চ, ২০০২ তারিখে ১ম জেলা ইজতেমা চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে বায়তুল বাসেত মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

এতে মোট ১০০জন খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

সেক্রেটারী
১ম জেলা ইজতেমা, ২০০২, চট্টগ্রাম জেলা

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার কনিষ্ঠা কন্যা আমাতুন হাফিজ বুশরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর ইচ্ছাময়ী পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। সে ৮ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায়ও ১ম স্থান অধিকার করে ৯ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালগাও এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম জনাব দুধ মিয়া সাহেবের পৌত্রী এবং তাজহাট রংপুরের মরহুম জনাব আব্দুল জাহের সাহেবের দৌহিত্রী। তার দীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোঃ আব্দুল আউয়াল মাষ্টার, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালগাঁও, বি.বাড়ীয়া

শোক সংবাদ

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালগাঁও-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, জনাব দুধ মিয়া সাহেব বার্ধক্যজনিত রোগে বিগত ১০ইং ডিসেম্বর, ২০০১ইং ভোর রাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ১০০ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র, ৩ কন্যা এবং অনেক নাতী-নাতনী রেখে গিয়েছেন। তাঁর আত্মার মাগফিরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

মোঃ আব্দুল আউয়াল মাষ্টার, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
শালগাঁও, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

শুভ বিবাহ

♦ জনাব শেখ ছলিম উদ্দিন-এর কন্যা সোনিয়া সিদ্দিকা (লাইলী) সাং- ভাদুঘর (পূর্ব), বি-বাড়ী-য়া-এর সাথে জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন -এর পুত্র জনাব মোঃ শিপন আহমেদ, সাং- তেরগাতি, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ এর বিয়ে ৮০,০০১/- (আশি হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৬/১১/০১ তারিখ, রোজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন- জনাব এস এম, হাবিব উল্লাহ্, ঘাটুরা। বিয়েটি ন্যাশনাল রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৭২/০২ তারিখ ২১/০৪/০২।

♦ জনাব আবুল হোসেন গাজী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ হোসনেয়ারা (হিরা) সাং- যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা-এর সাথে আলহাজ্জ মনির উদ্দিন সরদার -এর পুত্র জনাব এস, এম, মঈদ হোসেন সাং- খেলার ডাঙ্গা, পোঃ রাজনগর, জেলা- সাতক্ষীরা, এর বিয়ে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৮/০১/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন বায়তুস্ সালাম মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব এনামুল হক রনি। বিয়েটি ন্যাশনাল রিশতানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৪৮/০২ তারিখ ২৫/০১/০২।

♦ জনাব সোহেল আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সাদেকা পারভিন (সুমি) সাং- ভৈরব বাজার, জেলা- কিশোরগঞ্জ-এর সাথে জনাব দরবেশ উসমান আলী -এর পুত্র জনাব মোঃ জহিরুল আলম সাং- উত্তর তল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর বিয়ে ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৮/০২/০২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কিশোরগঞ্জ কনের পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব দেওয়ান মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, নারায়ণগঞ্জ। বিয়েটি ন্যাশনাল রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৬৮/০২ তারিখ ০৫/০৪/০২।

♦ জনাব নাছির আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নাহিদা আক্তার (পাখী), সাং- কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া,বাংলাদেশ-এর সাথে আব্দুল রাজ্জাক-এর পুত্র জনাব আব্দুর রহমান নাসিম সাং- আহমদীয়া মহল্লা, কাদিয়ান, জেলা- গুরুদাসপুর, ভারত-এর বিয়ে ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৬/০৬/৯৮ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি.বাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব হাফেজ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম। বিয়েটি ন্যাশনাল রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৬৯/০২ তারিখ ১৪/০৪/০২।

♦ জনাব গোলাম আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ তাহ্মিনা বেগম (লিলি), সাং- সুলতানপুর, পোঃ চরসিন্দুর, জেলা- নরসিংদী-এর সাথে জনাব সৈয়দ আহমদ সরকার-এর পুত্র জনাব জসিম উদ্দিন সরকার সাং- ক্ষুদ্র বি.বাড়ীয়া-এর বিয়ে ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৪/০৩/০২ তারিখ রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি.বাড়ীয়া, উত্তর আহমদীয়া পাড়াস্থ হেজবুল বারীর গৃহাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মোঃ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। বিয়েটি ন্যাশনাল রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৭০/০২ তারিখ ১৮/০৪/০২।

♦ জনাব মোঃ উমর মিয়া-এর কন্যা মোসাম্মাৎ তাহমিনা বেগম, সাং- হরিনাদী, ডাকঘর-ঘাটুরা, জেলা- বি.বাড়ীয়া-এর সাথে জনাব মোঃ ইয়াকুব মিয়া-এর পুত্র জনাব মোস্তাক আহমদ সাং- মোড়াইল, জেলা-বি. বাড়িয়া, এর বিয়ে ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৫/০২/০২ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ্ আসাদ, ঘাটুরা। বিয়েটি ন্যাশনাল রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৭৩/০২ তারিখ ২১/০৪/০২।

♦ জনাব হাবিবুর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সাদিয়া আফরিন, সাং- উত্তর আহমদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে জনাব মোঃ সামসুল কবির-এর পুত্র জনাব মোঃ নুরুল কবির (মনির) সাং- হরিশপুর, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম-এর বিয়ে ১,২০,০০১/- (এক লক্ষ বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১২/০৪/০২ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বি.বাড়ীয়া কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। বিয়ের এলান করেন জনাব মোঃ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। বিয়েটি ন্যাশনাল রিশ্তানাতা দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে, যার রেজিঃ নং ০২৭৪/০২ তারিখ ২১/০৪/০২।

এ বিয়েগুলো সার্বিকভাবে বা-বরকত হওয়ার জন্য সকলের দোয়া প্রার্থনা করছি।

মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর

খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য

যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর

অব্যাহত অগ্রযাত্রায়

আমাদের

অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

ন্যাশনাল আমীর ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন

মাহিগঞ্জ জামাতের সদস্যদের সাথে

রংপুর জামাতের সদস্যদের সাথে

বীরপাইকশা জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম আব্দুল হাকিম সাহেবের কবর যিয়ারতরত

রংপুর জামাতের প্রবীন আহমদী মরহুম বদীরউদ্দিন উকিল সাহেবের কবর যিয়ারতরত

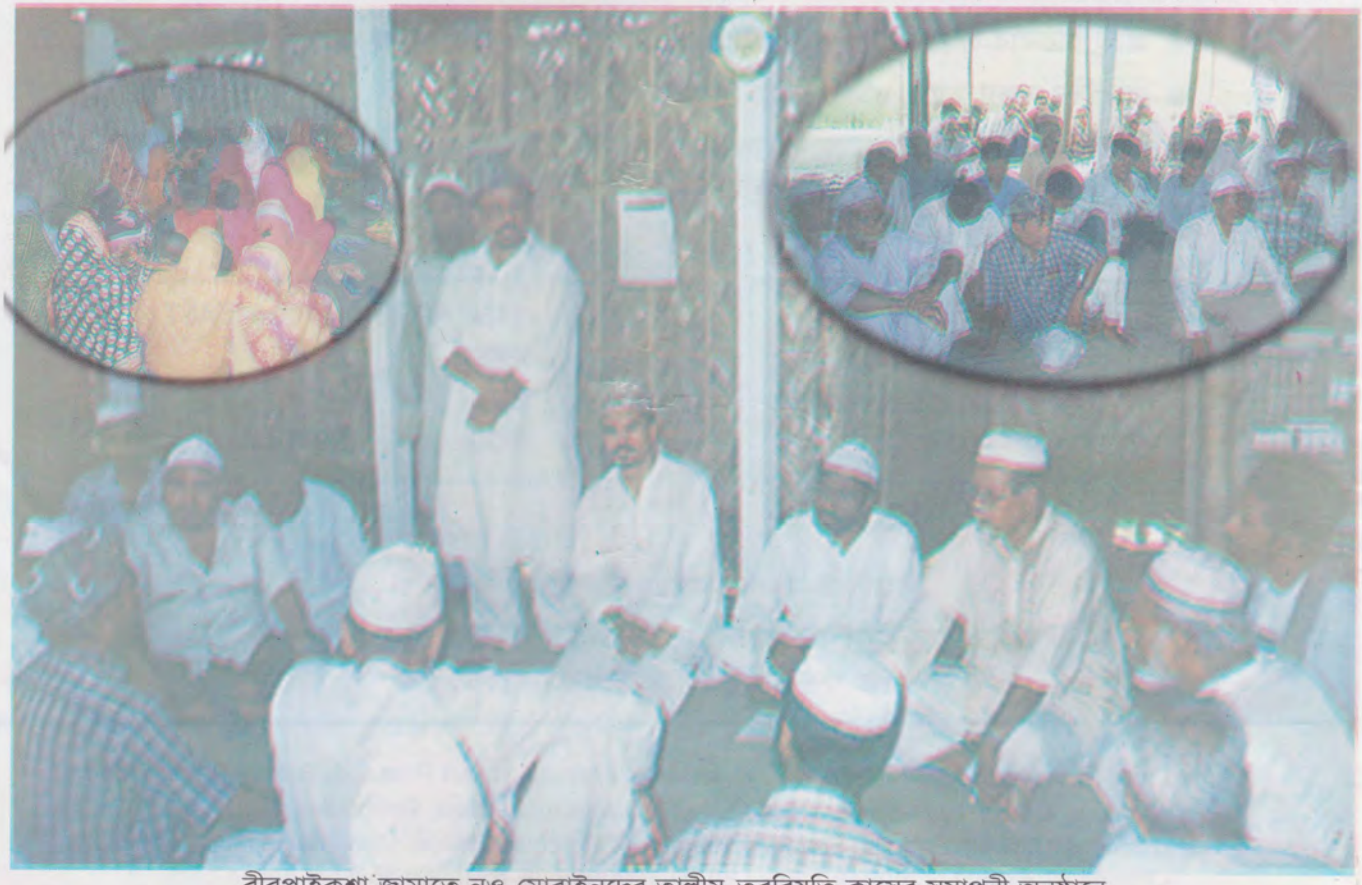

বীরপাইকশা জামাতে নও-মোবাইনদের তালীম-তরবিয়তি ক্লাসের সমাপনী অনুষ্ঠানে

New Vo. No. 64 ◆ 20th Issue April 30, 2002 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com